ভাষা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও বিবিধ নিবন্ধ

বলাইচাঁদ হালদার

ভাষা : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা
ও
বিবিধ নিবন্ধ

ড. বলাইচাঁদ হালদার

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
দপ্তর
ভারতী বুক এজেন্সী
৬৬/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ঃ ৭০০ ০০৯

BHASHA : DAKSHIN CHABBISH PARAGANA O
BIBIDHA NIBANDHA
(A Collection of Bengali Essays)
By— Dr. Balai Chand Haldar

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা, ২০০৭

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬৬/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণ সংস্থাপন
ছায়া গ্রাফিক্স
২১১ই বাগমারি রোড
কলকাতা-৭০০ ০৫৪

মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স
কলকাতা-৯

কলেজ স্ট্রীটে প্রাপ্তিস্থান
দে বুক স্টোর
একুশ শতক
দে'জ পাবলিশিং

মূল্য : সত্তর টাকা

উৎসর্গ

ছাত্রছাত্রী

ও

সহকর্মীবৃন্দ

নেতাজীনগর ডে কলেজ

কলকাতা

প্রাক্‌কথন

বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্যে লেখা রচনাগুলি গ্রন্থাকারে বিধৃত হল। এর মধ্যে কয়েকটি কলেজ বা বিদ্যালয় পত্রিকার চাহিদা মেটাতে লেখা। অধিকাংশ রচনাই শহর বা মফস্বলের ছোট পত্র-পত্রিকার তাগিদে বা নির্দেশে লেখা। পত্র-পত্রিকাগুলি এই সব রচনার ধারক ও বাহক ছিল বলে এই সুযোগে সংশ্লিষ্ট পত্র-পত্রিকার সম্পাদক বা সম্পাদক মণ্ডলীকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। লেখাগুলি যদি কিছুসংখ্যক পাঠকেরও কোনো না কোনোভাবে কাজে লাগে তাহলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

শান্তিনীড়, ডায়মন্ডহারবার
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা
পিন-৭৪৩৩৩১

সূচিপত্র

ডায়মন্ডহারবার অঞ্চলের ভাষা-ভাবনা

জীবন্ত ভাষার চর্চা একালের ভাষা বিজ্ঞানীদের মনোযোগ বেশি বেশি করে আকর্ষণ করছে বলেই অঞ্চল বিশেষের ভাষা গবেষণা ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছে। বস্তুত কোন একটা বিশেষ অঞ্চলের ভাষা বৈশিষ্ট্য খুঁটিনাটিভাবে লক্ষ্য করলে ভাষার বিচিত্র চেহারা ও চরিত্র পরিষ্কার ধরা পড়ে। ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলের ভাষা শ্রুতিমধুর না শ্রুতিকটু, ভাল না মন্দ সেটা বিচার্য নয়। সেটা যেমন আছে সেইভাবেই তাকে দেখতে হবে। অতি বড় ভাষা-তাত্ত্বিকের কানও উপভাষার বৈচিত্র্য সব সময় ঠিকমত ধরতে পারে না ; কারণ একটা অঞ্চলের ভাষায় উচ্চারিত শব্দ বা বাক্যাংশ ও বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে বিচ্ছিন্নভাবে সেই সূক্ষ্ম পার্থক্যের মধ্যে না গিয়েও মোটামুটি বলা চলে standard colloquial Bengali বা মান্য চলিত ভাষার সঙ্গে এর অনেক তফাত। তবে উপভাষা থেকে বিভিন্ন শব্দ ও ক্রিয়াপদ আহরণ করে মান্যচলিত ভাষাও পুষ্ট হয়।

আপাতদৃষ্টিতে হয়তো শহুরে লোকেরা দখ্‌নো, বাঁক্‌ড়ী, মেদনিপুরিয়া, চাটগেঁয়ে ইত্যাদি বলে কোন জেলা বা অঞ্চলের ভাষাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে থাকে। কিন্তু এরূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভিত্তি নেই। কারণ ভৌগোলিক কারণে দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার পরিবর্তন হবেই ; তাছাড়া শারীরিক বা মানসিক কারণেও রূপগত পার্থক্য দেখা দেবে। স্বরযন্ত্রের পার্থক্য একই শব্দের বিভিন্ন উচ্চারণগত রূপ দেখাবে। ফলে একই শব্দ একজন ইংরেজ বা রুশ কিংবা জার্মান বা জাপানী ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ করবে। একইভাবে একই দেশের একই অঞ্চলের অধিবাসীরাও একই শব্দ ভিন্নভাবে উচ্চারণ করে। একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে সেই পার্থক্য ধরা না পড়লেও ব্যবধানে সেই পার্থক্য পরিষ্কার ধরা পড়ে। জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করেও সাধারণের বোধগম্য সহজ উদাহরণ দেওয়া যায়। ভ্রমণ বিলাসীরা দীঘা গিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের যে ভাষা শোনেন এবং একটু দূরে চন্দনেশ্বরে গিয়ে যে ভাষা শোনেন তাদের পার্থক্য জানানোর জন্য শুধু কানই যথেষ্ট ভাল সাক্ষ্য দেবে, টেপরেকর্ডারের দরকার হবে না, কায়মোগ্রাফ বা কৃত্রিম তালু তো দূরের কথা।

একটা ভাষায় অন্য ভাষার প্রভাব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি নানা কারণে পড়ে। বাংলা ভাষায়, আরবি, ফারসি, হিন্দি, ইংরাজি, ফরাসি, পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ ইত্যাদি ভাষার প্রভাব প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণেই এসেছে। অসংখ্য ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় আজ এমন রূপ নিয়েছে যে বহু কষ্ট করেই তাদের স্বরূপ বোঝা যায়। 'কেদারা' শব্দের অর্থ আজ আমাদের কাছে অচেনা মনে হলেও 'চেয়ার' বুঝতে কারো কষ্ট হয় না। উপভাষায় এই ধরনের অনেক পরিচিত শব্দ আছে যার মূল জানা যায় না। কিন্তু জানা গেলে বোঝা যায় যে এই অঞ্চলের মানুষ ও ভাষা বৃহৎ দেশের অংশ। রাজনৈতিক ঝড় ও ঝঞ্ঝা

শুধু শহরের ওপর দিয়েই বয়ে যায় না। তার রেশ গ্রামাঞ্চলেও পড়ে। গ্রামের মানুষও একটা শব্দকে জীবিকা বা রুজি-রোজগারের স্বার্থে বয়ে আনে শহর থেকে বা তার কর্মস্থান থেকে। পরে অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত মানুষের মুখে ঐ শব্দ বিকৃত রূপ ধারণ করে। ঐসব ব্যক্তি শব্দগুলিকে তাদের পরিচিত শব্দের সাদৃশ্যে বা নিজেদের উচ্চারণের পক্ষে সুবিধাজনক রূপ দেবার চেষ্টা করে।

ধরা যাক একটা ইংরেজি শব্দ band-party। এই অঞ্চলে হয়তো উচ্চারিত হলো ব্যাঙ পার্টি। 'ব্যাঙ' এবং 'পার্টি' শব্দ দুটি এই অঞ্চলের মানুষের খুবই পরিচিত। তার সাদৃশ্যে শব্দটির যে রূপ উপভাষায় উচ্চারিত হলো তার সঙ্গে ইংরেজির কোন সাদৃশ্য আপাতদৃষ্টিতে পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলে কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিকের বা উপভাষাতাত্ত্বিকের মন আনন্দে ভরে যায় এবং সে আনন্দ আর্কিমিডিসের আবিষ্কারের পর 'ইউরেকা' চীৎকারের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

এক সহকর্মী বন্ধুর কাছে শুনেছি ঘাটশিলার বাজারে তিনি 'ডাঞ্চিবাবু' শুনে প্রথমে ভড়কে গেছিলেন। পরে যখন বুঝলেন যে কোন শাক-সব্‌জি damned cheap এবং তার সঙ্গে বাবু সম্বোধন যুক্ত হয়ে 'ডাঞ্চিবাবু' রূপ ধরেছে তখন নিজের মনে না হেসে পারেননি।

মেদিনীপুর যাওয়ার সময় এক মহিলাকে বলতে শুনেছিলুম তার ভাই তিন বছর ধরে 'পায়ে-পিঠে' পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারেনি। একটু ভাবার পরে উদ্ধার করেছিলুম মহিলার উদ্দেশ্য ছিল private-এ বলা। কিন্তু অশিক্ষিতা এই মহিলা ইংরেজি শব্দটা জানে না বলেই 'পায়ে-পিঠে' শব্দটি তৈরি করে ফেলেছেন। এই শব্দটি সৃষ্টির পেছনে মনস্তাত্ত্বিক কারণ একটা বড় অংশ গ্রহণ করেছে। কারণ ভাই খুব পরিশ্রম করেও পাশ করতে পারেনি এবং পরিশ্রমের সঙ্গে 'পায়'-'পিঠে'র অনুষঙ্গ তিনি খুঁজে নিয়েছেন। কারণ পরিশ্রমসাধ্য বহু কাজে পা এবং পিঠ একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে।

অনেক সময় উপভাষা অঞ্চলে একাট নির্দিষ্ট পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা ব্যবহার করে যা মান্য চলিত ভাষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বা অন্য রূপ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সেক্ষেত্রে সেই পরিবারের ভাষা নিভাষা (Idiolect) বলে গণ্য হবে। যেমন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এরকম নিভাষা ব্যবহারকারী অসংখ্য পরিবার দেখা যায়।

হয়তো কোনো উদ্বাস্তু পরিবার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে কলকাতায় বসতি স্থাপন করলো। সেক্ষেত্রে পরিবারের ছোট ছেলেমেয়েরা নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি সাধন করে প্রচলিত ভাষা বা তার কাছাকাছি ভাযা ব্যবহার করে ; কিন্তু ঐ পরিবারের বয়োজ্যোষ্ঠরা অনেক সময় তাদের পুরানো বাক্‌রীতি পরিবর্তন করতে পারে না। নতুনরা সবাই যে সম্পূর্ণ নতুন ভাযারীতি ব্যবহার করে তা অবশ্য নয়, তবে নতুন ভাষাকে গ্রহণযোগ্য মনে করলে প্রাণপণে তা আত্মস্থ করার চেষ্টা করে এবং সফল হয়। তবুও অজ্ঞাতসারে এমন কিছু রেশ থেকে যায় যা অনেকেই অসাবধানবশত ত্যাগ করতে পারে না। যেমন পূর্বতন পূর্ববঙ্গীয়রা (যারা এখন কলকাতাবাসী) অনেকে অনেক সময় মান্যচলিত বাংলা ব্যবহার করেও 'ইসে' শব্দটি কথার আগে ব্যবহার করে। তবে একে ঠিক ত্রুটি না বলে মুদ্রাদোষ বলা বোধহয় সমীচীন।

অনেক সময় অপব্যবহারের ফলে অনেক পুরানো শব্দ হারিয়ে যায়। মানুষ প্রয়োজনে যেমন সংস্কৃত বা বিদেশি শব্দকে নিজের ভাষায় অঙ্গীভূত করে নেয় তেমনি পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে পুরনো শব্দকে বর্জন করেও থাকে। যেমন প্রাচীন ভারতের যজ্ঞ-ব্যবস্থা পরবর্তীকালে লোপ পাওয়াতে তৎসম্পর্কিত অনেক শব্দও লোপ পেয়ে গেছে। যথা—সুব্রহ্মণ্য, ন্যুঙ্খ, যজ্বা, যাযজুক, স্থাণ্ডিল, আবসথিক, অহীন, সঞ্চায্য, সুত্যা প্রভৃতি। উপভাষার ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। কোনো পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরা হয়তো কতকগুলি শব্দ হামেশাই ব্যবহার করেন কিন্তু সুশিক্ষাপ্রাপ্ত সেই পরিবারের ছেলেমেয়েরা সেই সমস্ত শব্দকে অচ্ছুৎ বা 'গেঁয়ো' মনে করে সযত্নে পরিহার করে। ফলে এক সময় শব্দগুলো হারিয়ে যায়। অথচ সংগ্রহ করতে পারলে এই শব্দগুলোর মধ্যে একটা দেশের এক সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন কলে ধান ভাঙার আগে গ্রামাঞ্চলে ঢেঁকিতে ধান ভাঙা হতো। এই প্রথা লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে ধান উঁশলে গেলি কোতায়? বা 'ধান সিঁকে দিতে হবেনে' ইত্যাদি প্রয়োগগুলো লোপ পেতে বসেছে।

এই অঞ্চলে কাকদ্বীপ পর্যন্তও যখন বাস রাস্তা ছিল না বা যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুল ছিল এখানকার গরীব ব্যবসায়ীরা গোরুর পিঠে করে ধান নিয়ে অন্যত্র লেনদেন করতো। গরুর পিঠে ধান চাপানোর আগে ভাল করে চট বিছিয়ে (অনেকটা ঘোড়সওয়ার ঘোড়ায় বসার আগে যেমন জিন চাপায়) আসন পাততো। গোরুর পিঠে ঘর্ষণজনিত ঘা বাঁচানোর এই আসনকে বলা হতো 'ছালা'। বর্তমানে অনুরূপভাবে ধান নিয়ে যাওয়া-আসা বড় একটা দেখা যায় না। ফলে শব্দটা এখন খুব কম ব্যবহৃত হয় যা অঞ্চল বিশেষে লোপ পেয়েছে।

ছোটবেলায় দেখতাম এই অঞ্চলের লোকেরা ধানক্ষেতের মধ্যে 'পাতি' নামে এক শ্রেণীর ঘাস সংগ্রহ করতো। সেই ঘাস শুকিয়ে নিপুণ কুটির শিল্পীর মতো তার সাহায্যে মাদুর জাতীয় আসন তৈরি করতো। সেকালে অনেক ধনী বাড়িতেও এই আসন দেখা যেত। একে বলা হোত 'ঝেঁতলা' বা 'ঝ্যাঁতলা'। কালক্রমে মাদুর বা শীতলপাটি এবং শতরঞ্চি এসে এর স্থান নিয়েছে। এখনকার একটু বিত্তশালী মানুষরা এরূপ আসনের ব্যবহার ঠিক রুচিসম্মত মনে করে না। ফলে এই আসনটি লোপ পেতে বসেছে। অথচ তখন বহু বাড়িতেই তালপাতার বা খেজুর পাতার চাটাই বা 'চটি'র চেয়ে 'ঝেঁতলা' রাখা সম্মানের মনে করতো। এমন ঘর তখন খুব কম ছিল যখন বিছানা করতে গেলে বা ঘরে অতিথি এলে ঝেঁতলার খোঁজ পড়তো না।

অনেক গ্রামেই দেখা যায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজোর শেষে 'হরিলুঠ' হয়। 'হরিলুঠে'র প্রধান উপকরণ বাতাসা ছড়ানো। দেবতা হরি না হলেও হরিলুঠ কিন্তু সাধারণ ব্যাপার এবং 'বাবা পঞ্চাননে'র ধান দিয়ে হরি হরি বল বা মা কালীর ধান দিয়ে হরি হরি বল এরূপ কথা সমবেতকণ্ঠে উচ্চারিত হতো। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব এক সময় কত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল বয়স্কদের এরূপ আচরণ তার প্রমাণ। দেব হোক আর দেবী হোক, পঞ্চানন হোন আর সরস্বতীই হোন শেষে 'হরি হরি' বলা চাই। বলা বাহুল্য এই হরি চৈতন্যদেবের উপাস্য হরি—কৃষ্ণ। এরূপ অনুমানের সঙ্গত কারণও আছে। কারণ কোনো দুর্গোৎসবের সময় যে আসরে হরিনাম সংকীর্তন করা হতো সেই আসরকেই বৃন্দাবন মনে করে ছোট ছেলেমেয়েকে গড়াগড়ি খেতে বাধ্য করা হতো। ঐ আসরের প্রতিটি ধূলিকণাকে ব্রজধামের মতই পবিত্র মনে করা

হতো। তৎকালে প্রচলিত নাম সংকীর্তনের একটি ছত্র— "এই ধূলা মেখেছিল নন্দের ঘরের কানু। ধুলা নিবি আয় নিবি আয়।"

অনেক সময় অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ খুঁজে পেতে হিমসিম খেতে হয়। কিন্তু গূঢ়ভাবে বিশ্লেষণ করলে ঠিক ঠিক অর্থটি উদ্ধার করা সম্ভব। যেমন মান্য চলিত বাংলায় 'গা গুলোচ্চে' বললে বমি করা বুঝায়। কিন্তু অঙ্কের প্রশ্ন দেখে 'মাথা গুলিয়ে' যাওয়া আর গা গুলিয়ে যাওয়া এক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ঠিক তেমনি এই অঞ্চলে গ্রামের মানুষরা বহুজনে মিলে 'পুকুর গুলোয়'। এর অর্থ হলো জল তোলপাড় করে এমন অবস্থা করা যাতে পুকুরের শেষ মাছটি পর্যন্ত যেন মরে ভেসে ওঠে। সুতরাং মূল কথা হল জল ঘোলা করা। এর থেকে ঘোলানো এবং ঘুলিয়ে থেকে মুখে মুখে গুলিয়ে আসা স্বাভাবিক। আমাদের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া ঠিকমত না চললেও শরীরের মধ্যে তোলপাড় আনা স্বাভাবিক এবং তখন যদি 'গুলোন' কথাটি 'বমি বমি' অর্থে ব্যবহৃত হয়তো খুব অযথার্থ হয় না।

ভাষাতাত্ত্বিকের বা উপভাষাতাত্ত্বিকের কাছে 'শোউরো লাউ' একটা সুন্দর গবেষণাযোগ্য শব্দ। কলকাতাবাসীরা যাকে কুমড়ো বলে এই অঞ্চলে একে বলা হয় 'শোউরো লাউ'। কিন্তু এ অনুমান অযৌক্তিক নয় যে শহর থেকেই এই শব্দটি গ্রামে আমদানি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে সাদা বা কচি কলাপাতা রঙের বা সবুজ রঙের এক বর্ণ বিশিষ্ট যে লাউ দেখা যায় তাকে অনেকে বলেন দিশি লাউ বা দিশলাউ। স্বাভাবিকভাবে এই শ্রেণীর মানুষ শহরে গিয়ে যখন কুমড়োকে লাউ বলতে শুনেছে— এঁরা গ্রামে এসে দিশলাউ-এর সঙ্গে পার্থক্য বোঝানোর জন্য হয়তো প্রথম 'শহুরে লাউ' ব্যবহার করতো। কালক্রমে এটা ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে 'শোউরো' রূপে এতদঞ্চলে ব্যবহার করা হয়। তবে এর পেছনে সাদৃশ্য (Analogy) গত আরেকটা কারণ থাকতে পারে। 'শ্বশুর বাড়ি' শব্দটি এই অঞ্চলে 'শোউরো বাড়ি' রূপে ব্যবহৃত হয়। অতএব পরিচিত উচ্চারণভঙ্গী 'শহুরে' থেকে আগত 'শোউরো'র সঙ্গে আর কোন পার্থক্য রাখেনি।

টমাটোর সাধারণ উচ্চারণ দঃ ২৪ পরগনা অঞ্চলে টমাটোম। এই অঞ্চলে এই শব্দ 'বিলিতি বেগুন' বা 'গুড বেগুন' রূপে উচ্চারিত হয়। বিলিতি শব্দটি বিলাত থেকে আগত বা বিদেশ থেকে আগত অর্থে মান্য চলিত বাংলায়ও ব্যবহার হয়। ফলে প্রথম দর্শনে এই অঞ্চলের মানুষ অন্য নাম খুঁজে না পেয়ে গোলাকার বেগুনের মত বীজযুক্ত নরম অথচ সুদর্শন এই আনাজটিকে বিলিতি বেগুন আখ্যা দিয়েছে। আর সাহেবদের আমদানি করা জিনিস মানেই 'ব্যাড' নয়, 'গুড' এ ধরনের সংস্কার কি 'গুড বেগুনে'র প্রস্তুতিতে সহায়ক হয়েছে?

আবার 'বে-টাইমের বদলে 'অনটাইম' ব্যবহার করার পেছনেও সাদৃশ্য ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ কাজ করেছে বলে অনুমান করি। বেটাইম শব্দটি সৃষ্টি ফারসি উপসর্গ বে+ইংরাজি time যোগে। কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষ বার বার ওনাছিষ্টি, (অনাসৃষ্টি) ওনামুখো, (অনামুখো) ওনাবিষ্টি, (অনাবৃষ্টি) ইত্যাদি শুনতে শুনতে ফারসি 'বে' উপসর্গকে তাড়িয়ে 'টাইম'-এর আগে 'অন'কে এনে হাজির করেছে।

বিখ্যাত জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক Maxmuller যথার্থই বলেছেন The real and natural life of language is in its dialects. তাই মুখের ভাষা নিয়ে বর্তমান পৃথিবীর ভাষা বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছেন যে অপরাধ জগতের

ভাষা, পাতালপুরীর অন্ধকারজগতের ভাষা বা বহুল প্রচলিত স্ল্যাং ও এক সময় সাহিত্যের ভাষা হতে পারে এবং বহুল ব্যবহারের ফলে এক সময় মৌখিক ভাষায় সহজেই স্থান করে নেওয়া অসম্ভব নয়। অনুরূপভাবে প্রতি দশ বছর অন্তর যদি উপভাষার ইতিহাস ও নানাবিধ পরিসংখ্যান জানা যেতো তাহলে দেখা যেতো কত উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ লিখিত ভাষার প্রশ্রয় পয়েছে। সে হিসাবে উপভাষার শব্দাবলী যে সাহিত্যিক ভাষা সমৃদ্ধ করতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে উপভাষা থেকে আহৃত কোন শব্দের জোর এত বেশি হয় যে প্রচলিত সাধু বা চলিত ভাষার শব্দের সেই জোরই হয়তো নেই। 'তোর মাথায় যেন গজির কোট খেলতেছে।' আপাতদৃষ্টিতে বাক্যটির মর্মার্থ অনুধাবন করা শক্ত। কিন্তু যদি জানা যায় যে 'গজি' এই অঞ্চলের অতি প্রিয় এবং পরিচিত কম খরচের খেলা এবং সেই খেলায় জিততে হলে শারীরিক দক্ষতার সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রয়োজন যথেষ্ট, তখন 'মাথায় গজির কোট খেলার' বিশেষ আলঙ্কারিক অর্থ ধরা পড়বে। অর্থাৎ মাথায় নতুন কিছু পরিকল্পনা ঘুরছে যার সাহায্যে নতুন কিছু ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।

সময় বিশেষে কোন অনুষঙ্গ হয়তো শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে নতুন অর্থের দ্যোতনা করে। 'ভেড়ি' শব্দটি মান্য চলিত ভাষায় মাছের ঘেরি অর্থে প্রযুক্ত। অর্থাৎ মাছ চাষের জন্য আল দিয়ে ঘেরা বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ভেড়ি বলা হয়। পরে শুধু জমি ঘেরার আলকে 'ভেড়ি' বলা হয়েছে। এই অঞ্চলে অনেকেই ভেড়ি বলতে জমির আলকেই বোঝায় যার সঙ্গে মাছ চাষের উপযোগী জমির কোন সম্বন্ধ নেই।

জানতে ইচ্ছে করে 'হলুই দেওয়া' বাক্যাংশের মূলতঃ হোলি উৎসবের সাদৃশ্য আছে না হুল্লোড়ের সাদৃশ্য বেশি! অবশ্য হোলির কলরবের সঙ্গে আনন্দের সম্পর্ক থাকাটা প্রত্যাশিত কিন্তু যে কোন ধরনের গণ্ডগোল অর্থে 'হলুই দেওয়া' ব্যবহৃত হয় আলোচ্য ভাষা অঞ্চলে।

ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলী বা বাক্যাংশ যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে এমন একটি দৃষ্টান্ত 'দুতিয়েবে' (দ্বিতীয় বে)। এই অঞ্চলে ব্যবহৃত উল্লিখিত বাক্যাংশ বলবে যে গৌরীদান প্রথা বাংলাদেশের অপরাপর অনেক অঞ্চলের মত এখানেও গাঢ়মূল ছিল। সাধারণতঃ ৫/৬ বছর থেকে শুরু করে ৯/১০ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দিতে হতো। ফলে বিবাহ সম্পর্কে কোন ধারণা না নিয়েই কন্যাকে 'বধূ' হতে হতো। কন্যার স্বামী ও শ্বশুরকুলের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী কন্যা বিয়ের পর যে কোন জায়গায় থাকতো। পরে ঋতুমতী হলে এ অঞ্চলের ভাষায় 'যুগ্যি হলে' তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বার বিবাহ দিয়ে তবেই শ্বশুরালয়ে আনা হতো। অর্থাৎ এতক্ষণে সেই কন্যা সত্যিকারের বিবাহের ছাড়পত্র পেত। বেশি বয়সে বিয়ে হয় বলেই এখানকার মানুষরা বাক্যাংশটি ভুলতেই বসেছে। সুতরাং Peter Trudgill যথার্থই বলেছেন— "A study of language totally without reference to its social context inevitably leads to the omission of some of the more complex and interesting aspects of language and to the loss of opportunities for further theoretical progress." সমাজ ভাষাবিজ্ঞানীর এই সুচিন্তিত মত যে কোন অঞ্চলের ভাষাবিজ্ঞানীদের ভাবনার স্ফুলিঙ্গ।

ভাষা শিক্ষায় উচ্চারণ

শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সুশিক্ষার মত কুশিক্ষাও সারাজীবন ব্যাপী আমাদের সহচর হয়। এটি একটি সাধারণ সত্য।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। ছোট বেলায় শেখা ভুল উচ্চারণ, ভুল শব্দ অনেকে সারাজীবন বয়ে চলে এবং অবচেতন ভাবেই পরবর্তী প্রজন্মকেও বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করে।

শৈশবে পাঠশালায় বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের গুরোমশাই (গুরু মহাশয়) কান ধরে উচ্চারণ শিখিয়েছিলেন 'তালবেশ্‌শ' (শ)। বহুদিন পর্যন্ত ভাবতাম তালের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্যবশতই বোধ হয় অনুরূপ নামকরণ। বড় হয়ে ভাষা বিজ্ঞানের আলোয় বুঝেছি ঐ ধ্বনিটির (শ) উচ্চারণ স্থান তালু। তালুর সাহায্যে উচ্চারিত বলেই 'তালব্যশ' এবং তা হতেই তালবেশ্‌শ।

এমনি আরেকটি শিখেছিলাম 'বর্গেনেজ্য' (জ), তোতা পাখির মতো বহুদিন তাই-ই আউড়েছি। বোঝার মতো বয়স হলে বুঝলাম— আসলে বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জন বর্ণে দুটি জ আছে— একটি জ, অন্যটি য।

কিন্তু ক-বর্গ থেকে প-বর্গের মধ্যে একটির (জ) অবস্থান। অন্যটি স্পর্শবর্ণ আর উষ্মবর্ণের (শ, য, স, হ) মধ্যে অবস্থিত। তাই সেকালের নিয়ম অনুসারে দুটি জ কে পৃথক করার জন্যেই একটি 'বর্গীয় জ' অন্যটি 'অন্তঃস্থ য' বলে পরিচিত ছিল। যদিও অবশ্য এখনকার বাংলা উচ্চারণে 'জ' আর 'য' এর কোনো তফাত নেই। যাই হোক আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোকে না দেখার ফলে 'বর্গীয় জ' ও 'অন্তঃস্থ য' দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে 'বর্গেনেজ্য' ও 'অন্তজ্য'তে। স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে ই, ঈ, উ, ঊ, গুরোমশায়ের (গুরু মহাশয়ের) কণ্ঠ থেকে আয়ত্ত করেছিলাম হশ্‌শই, দিরঘই, হশ্‌শউ, দিরঘোউ। হওয়া উচিত ছিল হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ই, হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-উ। বলাবাহুল্য, অনুরূপ উচ্চারণ ও ছিল সংস্কৃত উচ্চারণের ঐতিহ্য বহন করেই। কারণ বাংলা উচ্চারণে হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণ সচরাচর হয় না। যেমন— নদী, যদি, কিংবা, কুল, কূল। বানানে পার্থক্য থাকলেও উচ্চারণে পার্থক্য বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়।

এই ছোট্ট নিবন্ধে আমার প্রতিপাদ্য হল শিক্ষক-শিক্ষিকার ভুল উচ্চারণ ও ভুল ভাষা শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের পরবর্তী জীবনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে এবং পরবর্তী সময়ে আবৃত্তি শিক্ষা, নাটকের সংলাপ উচ্চারণ ইত্যাদিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

পরিশীলিত উচ্চারণের মূল চাবিকাঠি হল স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির বিজ্ঞানসম্মত উচ্চারণ আয়ত্ত করা।

ভাষা ও সমাজচিত্র

ভাষার ইতিবৃত্তে সুকুমার সেন জানিয়েছেন যে শব্দের মধ্যে অনেক সময় একটি দেশের একটি সময়ের সামাজিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাস লুকিয়ে থাকে। সে কথা যে অব্যর্থ সত্য তা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি প্রবচনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রবচনটি নিম্নরূপ ঃ—

'হাতে কালি মুখে কালি বাবা আমার নিকে এলি।'

মোটামুটি ভাবে পঞ্চাশোর্ধ্ব স্ত্রী পুরুষের কাছে এই প্রবচনটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডায়মন্ডহারবারের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের কাছে তাঁদের ছেলেবেলার স্মৃতি উসকিয়ে দিয়ে সেকালের শিক্ষাব্যবস্থার একটি ছবি তুলে ধরে। বলাবাহুল্য এই ব্যবস্থার পিছনে সেকালের সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

প্রবচনটির মধ্যে অঞ্চলের একটি সময়ের প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছেলেদের চেহারার বর্ণনা পাই। অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত এই এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসা ছেলেদের বেশভুষার বালাই ছিল না। কারো পরণে শুধু হাফ প্যান্ট— কারো গায়ে শতচ্ছিন্ন গেঞ্জি, কারো গায়ে হাফশার্ট, কারো বা সম্পূর্ণ আদুল গা। 'ছাতা বগলে ছেলের দলে পাঠশালাতে যায়।' একালের দামি শ্লেট বা চকচকে বইয়ের বদলে প্রাথমিক ভাবে শিক্ষার্থীদের থাকত বগলে পাততাড়ি, হাতে কালির দোয়াত। যে দোয়াত আবার কড়ি বা মাটি দিয়ে তৈরি হয়। কাঠকয়লা গুঁড়ো করে কালি বা ধানসেদ্ধ হাঁড়ির পিছনের ভুষো কালি তাদের লেখার কালি। সঙ্গে থাকত পাতা মোছা ন্যাকড়া। এক একটা তালপাতায় অ-আ, ক-খ, ক্য-ক্র ইত্যাদি লেখা থাকতো কাঁটা দিয়ে। শিক্ষার্থীকে কঞ্চির কলমে কালি চুবিয়ে কাঁটার আঁকড়ি বুলোতে হত। একবার লেখা হলে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে আবার কোলের কাছে রাখা। শিখতে দেরি হলে গুরুমহাশয়ের চপেটাঘাত— কান্না এবং কালি হাতে কান্না মোছা। এই সময় শিশু বিদ্যার্থীরা চোখের জলে নাকের জলে একাকার হত। পরণে জামা-গেঞ্জি থাকলে তাই দিয়ে চোখ মোছা, না থাকলে খালি হাতে নাক মোছা, চোখ মোছা এবং নির্ধারিত সময় শেষ হলে বাড়ি ফিরে আসা। এটা ছিল সে সময়ের শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন ব্যাপার।

এই ব্যাপার শেষে বিদ্যালয় প্রত্যাগত ছেলেদের দেখে মা, বাবা, কাকা, জ্যেঠা বা শুভার্থীদের মুখ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে বের হত— হাতে কালি মুখে কালি ইত্যাদি।

লক্ষ্য করার বিষয় যে প্রবচনে 'মা আমার নিকে এলি' নেই। অর্থাৎ শিক্ষা প্রধানত ছেলেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মেয়েদের ক্ষেত্রে লেখাপড়া ব্যাপারটা ছিল গৌণ।

মুখে > মুকে (খ > ক)

লিখে > নিকে (ল > ন)

উল্লিখিত পরিবর্তনটি একটি বিশেষ আঞ্চলিক উপভাষার সুনির্দিষ্ট লক্ষণ।

ভাষা কলহ

সকাল বেলায় কনিষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে প্রায় খন্ডযুদ্ধ বাধার উপক্রম।

উপলক্ষ— বেহালা বাজার থেকে পুত্র কোন বস্তু কিনে এনেছে; রান্না করতে হবে পুত্রবধূকে।

— এটা কী এনেছ?

— পুঁই ভিঁটুলি।

— কী বললে?

— পুঁই ভিঁটুলি। সঙ্গে চিংড়িও এনেছি, মা খুব সুন্দর করে রাঁধত। অনেকদিন খাইনি। আচ্ছা করে রান্না কর তো।

— পুঁই মেটুলি কী ভাবে রান্না করে আমি জানি না। দাঁড়াও, তাহলে টেলিফোনে রান্নাটা শিখে নিই।

— কী বললে পুঁই মেটুলি?

— হ্যাঁ, তাইতো পুঁই মেটুলি।

— না, পুঁই ভিঁটুলি।

— পুঁই মেটুলি।

— পুঁই ভিঁটুলি।

— বলছি পুঁই মেটুলি।

— বলছি, পুঁই ভিঁটুলি।

রাগ চড়ে গেল শ্রীমানের। অগত্যা টেলিফোনে বাবাকে তলব। বাবা, পুঁই ভিঁটুলি না পুঁই মেটুলি?

— আমরা তো এখানে ভিঁটুলি বলি।

কী বল আমার জানার দরকার নেই, শব্দটা আসলে কী? মেটুলি না ভিঁটুলি।

— শোন্, এক একটা অঞ্চলে এক রকম বলতেই পারে।

— আমি কোন কথা শুনতে চাই না, কোনটা ঠিক শব্দ।

অগত্যা বললাম আচ্ছা টেলিফোনে বিল বাড়িয়ে লাভ নেই, আমি অভিধান ঘেঁটে তোকে জানাব।

ভাষাতত্ত্ব নিয়ে, যারা কারবার করেন তারা সহজে বুঝতেই চায়না যে সব অভিধানে সব শব্দ থাকে না, থাকতে পারেনা, থাকা সম্ভব নয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র আঞ্চলিক অভিধান আমাকে সাহায্য করতে পারল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক অভিধান এখন 'ভ' বা 'ম' এর ধারে কাছেও যায়নি। সংসদ অভিধানে শব্দটা পেলাম না। সুবল মিত্রের সরল

বাঙ্গালা অভিধানে নেই। সুধীর চক্রবর্তীর একটা লেখায় পাচ্ছি পুঁই মিচুড়ি। পাড়ায় এক প্রেসের শব্দরসিককে জিগ্যেস করতে নতুন শব্দ পেলাম ডেঁপুলি। অন্য অভিধানের মতই চলন্তিকা অভিধানে 'মেটুলি' শব্দ মেটে অর্থাৎ নিহত পশুর যকৃৎ অর্থে আছে। তবে 'পুঁই মেটুরি' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'পুঁইলতার পাকা বীজ'। যে খাদ্যবস্তুটি নিয়ে খন্ডযুদ্ধ সেটা আদৌ পাকা অবস্থায় খাওয়া হয় না। নাই হোক। তবে 'মেটুরি' শব্দটা অন্তত পুঁইয়ের সংগে লাগোয়া অবস্থায় পাওয়া গেল।

আমার অন্বেষণের ফল পুত্রকে জানাতে সে জানাল তাহলে তো দেখছি আমাকেই ভুল শিখিয়েছ। ও তো দেখছি জিতে গেল।

ভাষা বিজ্ঞানী এখানে জেতা-হারা এত সহজে মেনে নেবেন না। শব্দটা নেহাৎই আঞ্চলিক শব্দ। এর অনুসন্ধান করলে নিশ্চয়ই জানা যাবে যে শব্দটি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। ঠিক কত ধরনের শব্দ পাওয়া যাবে তা গবেষণা সাপেক্ষ। উৎসুকদের জন্য এর গবেষণার ভার ছেড়ে দিয়ে একটা যুৎসই উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝানো যাক।

আমরা যাকে গোসাপ বলি ইংরেজি অভিধানে (The Concise Oxford Dictionary) তাকে বলা হচ্ছে Newt। কিন্তু 'Dialectology' গ্রন্থে J. K. Chamber এবং Peter Trudgill জানিয়েছেন একটা প্রশ্নের উত্তরে ৩৪টি শব্দও পাওয়া গেছে। প্রশ্নটা ছিল— What do you call that small, four-legged, long tailed creature, blackish on top, it darts about on ponds? Ask, Askel, Azgel, Eff, Alvet, Esker, Yolt থেকে Lizard, Mewt থেকে Newt ইত্যাদি নানা ধরণের ৩৪টি শব্দ পাওয়া গেল। Oxford অভিধান নিল Newt কে। তাহলে বাকি শব্দগুলো কি ভুল? আদৌ নয়। প্রত্যেকটি শব্দই জীবন্ত এবং ঠিক। Display map for 'newt (Orton 1960 : 343) থেকে জানতে পারি 'Ask holds sway in the far north, Evet in the south-west, and Ebbet in the south-east. আবার a trend for Askel and Asker in the east midlands'. সুতরাং কোন শব্দটিই প্রকৃত অর্থে ভুল নয়। এক একটি অঞ্চলে ভাষাভাষীরা এক একটি শব্দকে চেনে এবং অজ্ঞতা থাকলে অন্য শব্দগুলিকে ভুল বলবে। একজন সাধারণ ভাষাভাষীর সঙ্গে একজন ভাষাতাত্ত্বিক বা ভাষা বিজ্ঞানীর তফাত এখানটায়। কারণ তার দৃষ্টিটা অনেক ব্যাপক। সাধারণ অভিধানে এই শব্দগুলির হদিশ নাও পাওয়া যেতে পারে। পেলেও নানা কারণে যে শব্দটি গুরুত্ব পায় হয়তো সেই শব্দটিকে কোন অভিধান করে গ্রহণ করে। তার অর্থ কখনই তা নয়, যে অন্য শব্দগুলি ভুল।

আশা করি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটি পড়ার পরে আমায় পুত্র ও পুত্রবধূর মতো অনেকেরই খন্ডযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে।

গোড়ে বাগাড়ে কোচুবেড়ে

ডায়মন্ডহারবার-কলকাতা রেলপথের নরেন্দ্রপুর হল্টএবং বাঘাযতীনের মধ্যবর্তী একটি স্টেশন গড়িয়া। ডায়মন্ডহারবার-কাকদ্বীপ বাস রাস্তায় হটুগঞ্জ ছেড়ে পড়বে বাগাড়িয়া। আর গঙ্গাসাগর মেলা যাবার সহজ পথে হারউড পয়েন্ট থেকে খেয়া পার হলে কচুবেড়িয়া।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়'এই তিনটি স্থান নাম গড়িয়া, বাগড়িয়া ও কচুবেড়িয়া এই অঞ্চলে বহুমুখে উচ্চারিত হয় গোড়ে, বাগাড়ে ও কোচুবেড়ে। স্কুল কলেজের ছেলে-মেয়েরা সচেতন উচ্চারণে গড়িয়া, বাগাড়িয়া এবং কচুবেড়িয়া উচ্চারণ করে এবং দ্বিতীয় ধরনের উচ্চারণের কারণ হিসেবে অজ্ঞতা ও জিভের আড়ষ্টতাকে দোষ দেয়। আর দ্বিতীয় ধরনের উচ্চারণ যে গ্রাম্য ও অনুচিত উচ্চারণ এটাই তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্রজনের ধারণা।

আমাদের মান্য চলিত ভাষায় উচ্চারণের একটা শ্রেণীভেদ ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথেরও মনে হয়েছিল এবং অনেক দৃষ্টান্ত তুলে তিনি লিখেছিলেন— 'পাঠকদিগকে তাহার কারণ আলোচনা করিতে সবিনয় অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।' বর্তমানের ভাষাবিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় উচ্চারণকে শুধু সহজ এবং স্বাভাবিক বলে ক্ষান্ত হবেন না, তাঁরা অনুরূপ উচ্চারণের যুক্তিসঙ্গত কারণ ও ব্যাখ্যা করবেন। এরূপ উচ্চারণের প্রধান কারণ স্বরের উচ্চতা সাম্য বা Vowel Height Assimilation.

আমরা নিচের ছকটার সাহায্যে অনুরূপ উচ্চারণের হদিশ খুঁজে পেতে পারি।

ই	উ
এ	ও
অ্যা	অ

আ

উপরের ছকটিতে বাংলা ভাষায় সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনি আছে। ই বা উ উচ্চারণে আমাদের জিভ সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থান করে আবার আ উচ্চারণে জিভের অবস্থান সর্ব নিম্নে। জিভ এক্ষেত্রে শুয়ে থাকে বললেই চলে। বাকি ধ্বনিগুলি ক্রমান্বয়ে সাজানো। স্বরের উচ্চতা সাম্য (প্রথাগত ব্যাকরণে যাকে স্বরসংগতি বলা হয়) আর কিছুই নয় জিভের দৌড়াদৌড়ি কমানো এবং পরিশ্রমের লাঘব ঘটানো। আর কে না কম পরিশ্রমে বেশি কাজ করে খুশি হয়? গড়িয়া শব্দে যে ধ্বনিগুলি পাই— গ্ + অ + ড় + ই + আ। এর মধ্যে দু'টি ব্যঞ্জনধ্বনি ও তিনটি স্বরধ্বনি। গ্-এর পরে অ এবং ড়-এর পরে ই এবং আ।

ছকটির দিকে তাকালে বোঝা যায় শব্দটির শেষের দুই ধ্বনির মধ্যে প্রথমটির অবস্থান সবেচেয়ে উঁচুতে আর শেষেরটির অবস্থান সর্বনিম্নে। ফলে এই ধ্বনিদ্বয়ে উচ্চারণের সময় দড়ি টানাটানি বা Tug of War শুরু হয়ে যায়। 'ই' মহাশয় উঁচু থেকে নামতে চাননা এবং 'অ'

মহাশয় শয়ন ছেড়ে উঠতে চাননা। উভয়ের টানাটানির ফলে 'ই' মহাশয় কিছুটা নিচে নামতে রাজি হন যদি 'আ' মহাশয় কিছুটা উপরে উঠতে রাজি হন। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোকের চুক্তি অনুসারে দু'জনেই কিছুটা কষ্ট স্বীকার করে জিভের পরিশ্রম লাঘব করে অর্থাৎ ই + আ > এ তে পরিণত হয়। জিভের অর্থাৎ আমাদের এই আরামপ্রিয়তাকে ইংরেজিতে বলে Principle of ease or Principle of least resistance। ফলে বাগাড়িয়া হয়ে যায় বাগাড়ে; কচুবেড়িয়া হতে চায় কচুবেড়ে এবং গড়িয়া হতে চায় গড়ে। কিন্তু গড়িয়ার 'গড়ে' না হয়ে 'গোড়ে' হবার কারণ হল গ্-এর পরাস্থিত অ ধ্বনি ও ড়্-এর পরস্থিত ই ধ্বনির পারস্পরিক টান। এই টানাটানির পরিণতি হয় অ + ই > ও। সুতরাং গড়িয়া হয়ে যায় 'গোড়ে'। অনুরূপভাবে কচুবেড়িয়ার ক-এর পরস্থিত অ এবং চ-এর পরস্থিত উ-র টানাটানির ফল 'কোচু' এখানে স্পষ্টতই অ + উ > ও। বলা বাহুল্য আমাদের মান্য চলিত ভাষায় বানানে এই রূপান্তর প্রায়ই দেখানো হয় না।

ফলত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা যেখানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মানুষের অনুরূপ উচ্চারণকে স্রেফ দখ্নো লক্ষণাক্রান্ত বলে বড়জোর মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে স্মরণ করে আঞ্চলিক ভাষার দোহাই পাড়েন ভাষাবিজ্ঞানীরা কিন্তু সেখানে মুচকি মুচকি হাসলে দোষ দেওয়া যাবে কি?

ভাষার উন্নাসিকতা

All that glitters is not gold পুরানো ইংরেজি প্রবাদ। স্টিফেন লিকক বুঝিয়েছেন বর্তমান যুগে All is gold that glitters.

ভাষার ক্ষেত্রে এ কথাটা সমানভাবে প্রযোজ্য। ভাল ভাষার কদর দুনিয়ায় সর্বত্র। এই ভাল মন্দ বোঝা যাবে কেমন করে? উত্তর পাওয়া যাবে যেমন ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ ইত্যাদি।

তাই বাংলাভাষীরা ইংরিজিকে অনুকরণ করতে চায় কেননা ওই ভাষা উন্নত। এর কদর আছে কর্মক্ষেত্রে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক স্তরে।

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে চোখ রাখলে দেখব বাংলার কদর কম নয়। রবীন্দ্রনাথ-অমর্ত্য সেনরা তা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রথমজন বাংলা ভাষার কবি হিসেবে এবং দ্বিতীয় জন বাঙালী হিসেবে এই মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

প্রশ্ন হল কোন্ বাংলা ভাষা? উত্তর মান্য চলিত বাংলা।

ফলে আঞ্চলিক বাংলাভাষীদের নজর থাকে মান্য চলিতে ব্যুৎপত্তি অর্জনের— প্রয়োজনে নিজের মাতৃভাষা (এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা) বিসর্জন দিয়ে বা আত্মগোপন করে। তাই একজন চট্টগ্রামের অধিবাসী বা বাঁকুড়া ও পাঁশকুড়া বা ক্যানিং ও পাথরপ্রতিমার অধিবাসী শিক্ষিত হলেই নিজের ভাষাকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গোপন করার চেষ্টায় থাকে— যদিও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শতকরা একশ ভাগ গোপন থাকে না।

আমার বক্তব্য এই গোপনীয়তার মনস্তত্ত্বগত কারণ ভাষার উন্নাসিকতা— অর্থাৎ মান্য চলিত ভাষার দখলদারের কাছে ধরা পড়ে যাবার ভয়।

একটা সহজ উদাহরণ দিই— আমার এক পরিচিত নিরক্ষর বিত্তশালিনী ঠাকুরমার কাছে তার একমাত্র নাতি এসে বলল দিদু। কাঁজী পাড়ায় নরেন আমার বল কেড়ে নে মারতে ছেলো।

দিদু তো রেগে কাঁই— "ছি ছি, নুনু, এরকম কথা বলো না। কাঁজী পাড়ার নরেনকে আমি দেখছি; কিন্তু তুমি এসব চাষাভুষোর ভাষা শিখলে কোত্থেকে?"

মনে পড়ে যায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের সোনা ও কমলার কথোপকথন।

'সোনা বলে ফেলল, আমি জ্যাঠামশাই এর পাশে বসমু। কমলা বলল, বসমু কিরে? বসব বলবি।

কমলা বললে, 'তুই এভাবে বললে তোকে সবাই বাঙাল বলবে।'

এই যে রাগের মাথায় মুখ থেকে 'চাষাভুষো' বেরিয়ে পড়া— এর পেছনে ভাষার

উন্নাসিকতা কাজ করছে। বক্তা এখানে বাঙালী। একটা বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসী। বিদ্যালয়ের শিক্ষা না পেলেও মান্য চলিত ভাষা রপ্ত করেছেন। তাই আদরের নাতির মুখে তথাকথিত 'চাষাভুষোর ভাষা' সহ্য করতে পারছেন না।

ভাষা বিজ্ঞানীরা এখানে ভাষীর অজ্ঞতার দিকটাই বড় করে তুলবেন। কারণ তাঁদের চোখে বিজ্ঞানগত দৃষ্টিতে দিদু ও নাতির ভাষার মধ্যে উপাদান গত কোন তফাৎ নেই।

তবে ভাষা বিজ্ঞানীরা যা ভাবুন না কেন ভাষীরা এখানে মান্য চলিতকে কাশ্মীরী শালের বা ঢাকাই মসলিনের মর্যাদা দেন। প্রমাণ— এক বাড়িতে তিনটি বউ এসেছেন। শাশুড়ি মুড়ি খেতে চান। এক বউ বললে— মুড়িটা নরমে গেছে। দ্বিতীয়জন বললে— মুড়িটা সিঁইতে গেচে। তৃতীয়জন বললে— "এ আবার কেমন ধারা কথা— 'নরমে', 'সিঁইতে' বাপের জম্মে শুনিনি। আমি তো জানি 'মিইয়ে' গেছে।"

ফলে তিনজনের অলিখিত চুলোচুলি। প্রত্যেকেই বলতে চায় তার ভাষাটাই ঠিক। প্রত্যেকেই তাদের ভাষা আয়ত্ত করার পর থেকেই অর্থাৎ নিজ নিজ বাড়ির গুরুজন বা আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে যা শিখেছে তা-ই পৈত্রিক সম্পত্তির মত কিছুতেই ছাড়তে চায়না।

এবারে শিক্ষিত বধূরা নিজের নিজের অভিধান খুলে প্রমাণ সাজাতে বসল, কিন্তু রাজশেখর বসুর চলন্তিকা, সুবল মিত্রের সরল বাঙলা অভিধান, সংসদ বাংলা অভিধান এই সমস্যার সমাধান করতে পারল না।

অগত্যা পাড়ার লাইব্রেরিয়নের দ্বারস্থ হওয়া গেল। লাইব্রেরিয়ান মহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র আঞ্চলিক ভাষার অভিধান তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান খুলতে নির্দেশ দিলেন। সমস্যা তাতেও মিটল না। ওপার বাংলার ভাষা আর এপার বাংলার ভাষায় প্রভেদ তো আছেই। তাছাড়া এপার বাংলার পূর্ণাঙ্গ অভিধান আজও তৈরি হয়নি। হলেও ভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য কতখানি দেখানো সম্ভব তাও চিন্তার বিষয়। তা সত্ত্বেও দুই বাংলার যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ অভিধান তৈরি হলে বধূমাতারা হয়ত একটা সমাধানে পৌঁছতে পারতেন। দেখতেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এক রকম বলে, হুগলীতে অন্যরকম আর মেদিনীপুর বা বাঁকুড়ায় আর একরকম। তখন হয়ত এই অনাবশ্যক চুলোচুলি বন্ধ হত।

কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রত্যেকেই তার আয়ত্তের ভাষাকে প্রকৃত ভাষা বলতে চান— মান্য বা অভিজাত বলতে চান। এখানেও কিন্তু একধরণের উন্নাসিকতা কাজ করছে। কারণ একই অর্থজ্ঞাপক এ জাতের কোন একটি শব্দ যদি মান্য চলিত ভাষায় ঠাঁই পেয়ে যায় তবে এ জাতের অন্য শব্দগুলো তুলনায় অচ্ছুৎ বলে মনে হয় সাধারণ ভাষাভাষীর কাছে।

ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে এই উন্নাসিকতা যুক্তিহীন, অজ্ঞাতপ্রসূত একধরণের অহমিকা।

বাংলা উপভাষায় বিদেশি প্রভাব

যে ভাষা যত সমৃদ্ধ সে ভাষার শব্দসম্ভার তত বেশি। স্বভাবতই নানা উপায়ে শব্দসৃষ্টির পাশাপাশি অন্য ভাষার শব্দ আয়ত্ত করেই জীবন্ত ভাষা সমৃদ্ধির পথে এগোয়। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বাংলাও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব সম্পদ ছাড়া আরবি, ফারসি, তুর্কি, ইংরেজি, ফরাসি, পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, রুশ, ইতালীয়, জার্মান স্পেনীয়, চীনা, জাপানি, মালয়ি, বর্মি ইত্যাদি ভাষা থেকে নানা সুত্রে আহৃত শব্দের মাধ্যমে ধনী হয়েছে।

বলা বাহুল্য যে এই আহরণ মূলত মান্য চলিত বাংলায়। কিন্তু মান্য চলিত বাংলার নানা উপভাষাও নানা সূত্রে শব্দ আহরণ করেছে। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নানা আঞ্চলিক ভাষার তন্নিষ্ঠ বিশ্লেষণে ও শব্দ সংগ্রহে।

বর্তমান নিবন্ধে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডায়মন্ডহারবার অঞ্চলের উপভাষায় ইংরেজি ভাষার নমুনা দেখিয়ে উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন করা হবে। আরবি, ফারসির পরে ইংরেজি ভাষার প্রভাবের প্রধান কারণ প্রায় দুশো বছরের ইংরেজ শাসন। একথা সবার জানা যে রাজভাষার কদর বেশি। আমরা প্রবাদে দেখি—

আরশি, আরশি, আরশি
আমার বউ পড়বে ফারসি।

অথবা

পড়ে ফারসি বেচে তেল
দেখো ইয়ে কুদরত কী খেল।

উক্ত প্রবাদদ্বয়ে ফারসি ভাষার প্রাধান্য এতটা যে বউকে ফারসি পড়িয়ে বিদুষী করার স্বপ্ন দেখা হচ্ছে। অথবা ফারসি পড়েও কেউ যদি তেল বেচে সংসার চালায় তো তার ভাগ্যকেই দায়ী করা হচ্ছে।

তেমনি রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল' গ্রন্থে আমরা লক্ষ্য করেছি কীভাবে ইংরেজি ভাষা না জেনেও 'Yes Sir', 'No Sir' দিয়ে কর্মোন্নতি হত। অর্থাৎ প্রশাসনে ইংরেজ থাকায় ইংরেজের ভাষা আয়ত্ত করার প্রাণান্ত চেষ্টা থেকেই এবং প্রায় দুশো বছরের মেলামেশার সূত্রে জীবনধারণের তাগিদেই ইংরেজি ভাষা মান্য চলিতের ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছে। আঞ্চলিক ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রমাণস্বরূপ ডায়মন্ডহারবার এলাকার নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যবহৃত কিছু শব্দের নমুনা দেওয়া হল।

অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দ	সম্ভাব্য উৎস
অড় < ওয়াড়	wear
আইডিয়ার	idea
আটইস্টিশান	attestation
অ্যালাউন্স করা	announce
ইনকুমারি	enquiry
ইন	ring
ইস্কুরুপ	screw
ইস্পিড	speed
ইস্পিরিট	spirit
ইনু	Renew
উটিং/উটিন	Routine
উটপ্যানসিল	woodpencil
এডিও	radio
এলেকটারি	Electric
এসকেল্লান্টি	Excellent
এস্টিরি	Registry
এগুলার	Regular
এললাইন	Railline
কড়	cord
কেবাসিটি	capacity
কারেন	current
কটন	cordon
গরমেন্ট	Government
গ্র্যান্টি	Guarantee
চুনকাম	Chewing gum
ছাপোট	Support
ছাট্টিপিট	Cerfiticate
ছিলেট	Slate
ছিট	Seat
ছিমেট	Cement
ছিংগেল	Signal

অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দ	সম্ভাব্য উৎস
ছেপটিন	Safetypin
জক	Jug
জেনটর	Generator
টিউকল	Tubewell
টিপশুনি/টিউশুনি	Tution
ট্যাকশো	Tax
টিপ	Trip
ডাক্তার	Doctor
ডেল্লাইট	Daylight
নম্প/ন্যাম্পো	Lamp
নিস্টি	List
নন্‌ঠোন/লণ্ঠন	Lantern
নজেন	Lozenge
পকমল	Pugmill
পোটমান	Portmanteau
প্যানসিল	Pencil
প্যান্টুন	Pantaloon
পিচবোড	Pasteboard
প্যাটেল	Paddle
পাট	Part
পোস্টোকাট	Postcaed
প্ল্যান্টি	Penalty
ফটোক	Photo
ফাস্টোকেলাশ	Firstclass
ফিমিলি	Family
বরফ করা	borrow
বাইশকোপ	Bioscope
বেলেট	Blade
বিরেক	Break
ভোঁট	Vote
মাস্টার	Master

অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দ	**সম্ভাব্য উৎস**
মিটিন	Meeting
মেম্বর	Member
সিগ্রেট	Cigarette
সিরিঞ্চি	Syringe
সিলিবর	Sliver
হাপশুল	Halfsole
হরেন	Horn
হেরকেন	Hurricane lamp

অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দগুলি আবার মান্য চলিত বাংলার মত উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগে নতুন শব্দ তৈরি করে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আবার একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ করে। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। সমাজোপভাষা (Sociolect) সমাজভাষা বিজ্ঞানের এক্তিয়ারে পড়ে।

ভাষার সম্মান ও লেখকের আত্মসম্মান

এবারের শারদীয় পত্রিকায় আমার এক লেখক বন্ধুর প্রবন্ধে সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপ খুব সম্মান হানিকর বলে তাঁর ধারণা। সম্পাদক ইচ্ছে করলে বিষয়বস্তু পছন্দ করতে না পারেন, লেখা ফেরত পাঠাতে পারেন, ভুল বানান সংশোধন করতে পারেন।

সে অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতবশত ঠিক বানানে বা নিয়ম মেনে লেখা ভাষায় হস্তক্ষেপ করলে লেখকের অহমিকায় লাগাটাই স্বাভাবিক। বস্তুত এই ঘটনা থেকেই নিবন্ধটির অবতারণা।

লেখকবন্ধুর অভিযোগ কোন এক কলেজ-অধ্যাপক-সম্পাদক তাঁর লেখার সমস্ত 'টি' গুলো কেটে 'টা' করেছেন। তাঁর জিজ্ঞাসা এরকম তিনি করতে পারেন কিনা অথবা কোন যুক্তিতে তিনি এটা করেছেন। দূরভাষণের মাধ্যমে তিনি জেনেছেন যে যেহেতু তাঁর প্রবন্ধটি চলিত ভাষায় লেখা সুতরাং অবধারিতভাবে তাঁর 'টি' হলো 'টা' এবং 'গুলি' বহুবচন প্রয়োগে 'গুলো' হয়েছে।

স্বভাবতই একজন সচেতন বাংলা ভাষার লেখক হিসেবে প্রশ্ন উঠবে চলিত ভাষায় লেখা বলেই 'টি'কে 'টা' বা 'গুলি'কে 'গুলো' করতে হবে কিনা। এর উত্তর এক কথায় 'না'।

কেন 'না', সেজন্য বাংলা ভাষার নিয়ম কানুন এবং সচেতন প্রতিষ্ঠিত ভাষাবিদ বা লেখকের লেখা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে Article বলে বাংলায় তা নির্দেশক চিহ্ন। কিন্তু নির্দেশক চিহ্ন 'the' ইংরেজিতে যেভাবে ব্যবহৃত হয় বাংলায় সেভাবে হয় না। 'ছেলেটি' বা 'ছেলেটা' বোঝাতে ইংরেজিতে ব্যবহৃত হয় 'the boy'। বাংলার ক্ষেত্রে নির্দেশক চিহ্নটি 'ছেলে' শব্দের পরে ব্যবহৃত কিন্তু 'boy' শব্দের আগে ব্যবহৃত হবে 'the' article টি।

কয়েকটি 'টি' বা 'টা' যুক্ত বাক্য লক্ষ্য করা যাক।

(১) ঘোড়াটা/ঘোড়াটি খোঁড়া বলে ছুটতে পারছে না।

(২) কোন রকমে প্রাণটা/প্রাণটি নিয়ে ফিরে এলাম।

(৩) এবারের বর্ষাটা/বর্ষাটি তো কাটুক।

(৪) একটা/একটি পয়সা দাওনা, বাবু।

(৫) মেয়েটার/মেয়েটির পাত্র জুটছে না।

(৬) হাসিটা/হাসিটি চাপতে পারলে না?

(৭) যদুটার/টির মাথায় গোবর ভরা।

উল্লিখিত বাক্যগুলির প্রথম ও দ্বিতীয়টিতে দ্বিতীয় প্রয়োগ অর্থাৎ 'ঘোড়াটি', 'প্রাণটি'

বললে একটু বেশি যত্ন প্রকাশ পায়। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে দুটিই সমার্থক কিন্তু উচ্চারণগত কারণে প্রথমটি প্রয়োগের ইচ্ছে জাগবে। পঞ্চম বাক্যে দুটি প্রয়োগের মধ্যে অর্থগত ব্যবধান প্রকট। 'মেয়েটার' বললে একটু তাচ্ছিল্যের ভাব থাকে কিন্তু 'মেয়েটির' বললে একটু আদর বা প্রশ্রয়ের ভাব স্পষ্ট। ষষ্ঠ বাক্যে প্রথম প্রয়োগের তুলনায় দ্বিতীয় প্রয়োগে সূক্ষ্মভাবে হলেও নির্দিষ্টতার চিহ্ন ধরা পড়ে। সপ্তম বাক্যে যদুকে অল্পবুদ্ধি ভাবার কারণে 'টা' প্রয়োগই স্বাভাবিক।

'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে ব্যাকরণিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'টি' সংকেতটি ছোটো আয়তনের জিনিস ও আদরের জিনিস সম্বন্ধে এবং 'টা' বড় জিনিস সম্বন্ধে বা অবজ্ঞা কিংবা অপ্রিয়তা বুঝাইবার স্থলে বসে। কতখানি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও চিন্তাশীল মন থাকলে তবে এই সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি ধরা পড়ে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। উক্ত গ্রন্থে বা 'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'টি' 'টা' সহ নির্দেশক চিহ্নগুলি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন।

আবার পূর্বপ্রসঙ্গে আসি। লেখকবন্ধুর 'টি' গুলি কচুকাটা হবার প্রধান কারণ বোধ করি সম্পাদকের চলিত ভাষা সম্বন্ধে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি। সেটি হলো সাধুভাষায় 'টি' এবং 'গুলি' আর চলিত ভাষায় 'টা' এবং 'গুলো'।

একথা এখন সর্বজনবিদিত যে বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' বা 'শকুন্তলা'র সাধুভাষা আর গতকালের আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমের সাধুভাষা এক নয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' বা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতুম প্যাঁচার নকসা'র চলিতভাষা আর আজকের যুগের চলিতভাষা এক নয়। সাধুভাষার ন্যায় চলিতভাষাও বহু পরিবর্তন বিবর্তনের ধাপ পেরিয়ে এসেছে। সাধারণভাবে পরীক্ষকরাও মূলত সর্বনাম, ক্রিয়াপদ বা প্রাচীন তৎসম শব্দ ছাড়া সাধু ও চলিতের বড়ো একটা পার্থক্য খুঁজতে চাননা। সেক্ষেত্রে সম্পাদক মহাশয় কেন যে লেখক বন্ধুর ওপর এত নির্দয় হয়ে আত্মসম্মানে আঘাত দিলেন তা সহজবোধ্য নয়।

সম্পাদকের জ্ঞাতার্থে বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা যে তাঁদের চলিত ভাষার রচনায় 'টি' বা 'গুলি' ব্যবহার করেছেন তার নিদর্শন দেওয়া হল।

(ক) মনে পড়ল, কে একজন নবীন নাট্যকার যশঃপ্রার্থী, তার নাটকের গানগুলিতে সুর দেবার জন্য কবির কাছে এসেছিল। বেশী নয়, গোটা বাইশেক গান; প্রত্যেকটিতে সুর দিতে, এমন আর কি, বড়ো জোর আধ-ঘন্টা করে সময় লাগবে।

— সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়/'পথের স্মৃতি'

(খ) কাহিনীটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ভান্ডারের (আশ্রমের একজন মারাঠি ছাত্র) একটি সৎকর্মের উপর।

—সৈয়দ মুজতবা আলী/'ভান্ডারে-গুরুদেব'

(গ) এই বইটির প্রথম সংস্করণে প্রধানত পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলির ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার কথাই লেখা হয়েছে। ১৯৯১ সালের অক্টোবরে সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে দেশটির ভেঙে পড়া ও রাশিয়া, ইউক্রাইনের মতন পৃথক রাজ্যগুলির অভ্যুত্থানের সময় আমি মস্কো এবং সেন্ট পিটার্সবার্গ (লেলিনগ্রাড) গিয়েছিলাম।

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় / 'ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ,' ভূমিকা।

(ঘ) সাহিত্য সাধনার ভিন্ন ভিন্ন মার্গ আছে। একটি হচ্ছে কর্মকান্ড। সভাসমিতির সভাপতিত্ব করে দরবার জানানো, গ্রন্থাবলী সম্পাদন করা, এগুলি হল কর্মকান্ডের অন্তর্গত।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / 'সভাপতির অভিভাষণ', ''সাহিত্যের পথে''

উপরের সাক্ষ্যগুলি এবং অন্যান্য উদাহরণের সাহায্যে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় কোন রচনা চলিত ভাষায় লিখিত হলেই 'টা' ও 'গুলো'র বদলে 'টি' ও 'গুলি' ব্যবহার চলবে কি না তা নির্ভর করে রচনার বিষয়, বক্তব্যের জোর দেওয়া না দেওয়া, বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ, যত্নত্ব বা অযত্নত্ব, আদর বা প্রশ্রয়, নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা, ছোটোত্ব বা বড়োত্ব, সম্ভ্রম বা অসম্মান, বিশেষত্ব বা নির্বিশেষত্ব, বস্তুবাচক বা প্রাণিবাচক বিষয়ের প্রসঙ্গ ইত্যাদি নানা অনুষঙ্গের উপর। তাছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে অর্থের তারতম্য না থাকলে লেখকের স্বাধীনতাও নিঃসন্দেহে সম্মানযোগ্য।

তাইজন্যে ওনারা

শেষ পর্যন্ত কে জেতে? লেখার ভাষা না মুখের ভাষা?

উত্তর বোধ হয় মুখের ভাষাই। তাই প্রচলিত অভিধান যে ফরমান জারি করুক না কেন শেষ পর্যন্ত আবার মুখের ভাষার ব্যাকরণ অনুসরণে নতুন অভিধান রচনা করতেই হয়।

'তাই' শব্দটির সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষী সকলেই পরিচিত। 'তাই' শব্দের অর্থ 'সেইজন্য'। উদাহরণ :

তাই তোমাকে আসতে বলেছিলাম।

সেইজন্যে তোমাকে থাকতে বলেছিলাম।

কিন্তু কখন অজান্তেই তাই + সেইজন্যে > তাইজন্যে নতুন জোড়কলম শব্দ (Portmanteau word) তৈরি হয়ে গেছে এবং মুখের ভাষায় মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমজনতা, সাহিত্যিক থেকে বিজ্ঞানী বা রাজনীতিবিদরা হামেশাই শব্দটি ব্যবহার করছেন। যেমন,

তাইজন্যে সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের এই চুক্তি।

তাইজন্যেই রায়চক থেকে কুঁকড়োহাটি ব্রিজ তৈরির প্রয়োজন।

পরবর্তী যুগের অভিধানকারকে এবার নতুন সৃষ্ট শব্দটির ব্যাকরণ তৈরির উপাদান দেখানোর সুযোগ না থাকলেও সসম্মানে শব্দটিকে নতুন অভিধানে ঠাঁই দিতে হবে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে মুখের ভাষায় সৃষ্ট শব্দটি জিতে যাবে। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় থেকে সুকুমার সেন, 'চলন্তিকা'কার রাজশেখর বসু থেকে আকাদেমি বানান সংস্কারকরা যতই নির্দেশ জারি করুন না কেন কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলা সম্ভ্রমবাচক সর্বনামের একই দশা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বাংলা ভাষার প্রথিতযশা বৈয়াকরণদের অভিপ্রায় ছিল :

	একবচন	বহুবচন
	ইনি	এঁরা
সর্বনাম	উনি	ওঁরা
	তিনি	তাঁরা
	কিনি (কে)	কাঁরা
	(বিরল ব্যবহার)	

লক্ষ্য করবেন এগুলির চেহারা বর্তমানে মুখের ভাষায় দাঁড়িয়েছে, দাঁড়াচ্ছে বা দাঁড়াতে চাইছে :

ইনি	এনারা
উনি	ওনারা
তিনি	তেনারা
কিনি	কানারা

বিশেষ করে 'এনারা' এবং 'ওনারা' রীতিমত চালু হয়ে গেছে এবং সর্বনাম দুটির সঙ্গে বিভক্তির 'র' যুক্ত হয়ে 'এনার' 'ওনার' ছোট থেকে বড়, খ্যাতনামা থেকে অখ্যাতনামা হামেশাই ব্যবহার করেছেন।

এনারা আমাদের কথা শুনছেন না।
ওনারা জ্ঞাতসারেই এই ভুল করেছেন।
এনার বাবা ছিলেন পর্তুগীজ।
ওনার পরিচয় এখনও পুলিশ জানতে পারেনি।

যারা খুব গল্পের বই পড়ার ভক্ত তাঁরা 'তেনারা' শব্দটা কোথাও কোথাও ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হতে দেখে বা শুনে থাকবেন। প্রসঙ্গ যখন থাকত ভূতের গল্পের জমজমাট পরিবেশ তখন বিখ্যাত লেখকদের হাতে গল্পের বিখ্যাত ভূতেদের নাম উচ্চারণের বদলে পাঠক 'তেনারা' শব্দটা ব্যবহৃত হতে দেখে থাকবেন।

কিন্তু সঙ্গ দোষ বড় দোষ। 'এনারা', 'ওনারা'র সাদৃশ্যে (Analogy) খুব শীগ্‌গিরই আমরা হয়তো 'তেনারা' দেখতে পাব। তেমনি পাব 'এনার', 'ওনার'-এর সাদৃশ্যে 'তেনার' শব্দটি। অবশ্য 'কানারা' ও'কেনার' শব্দের পদধ্বনি আমি এখনও তেমন শুনতে পাচ্ছিনা।

তবে ছলনাময়ী প্রকৃতির মত বহুরূপী ব্যাকরণ ভবিষ্যতে আবার কোন পথে বিচরণ করবে কে জানে!

লালন-ঐতিহ্য

মহাত্মা লালন ফকিরের সম্পর্কে কিংবদন্তিটি হল— অধুনাতন বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত কায়স্থ বংশে তাঁর জন্ম। বারুণী গঙ্গা-স্নান উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ যাবার সময় মতান্তরে পুরীধাম গমনকালে পথিমধ্যে বসন্তরোগে আক্রান্ত হলে সঙ্গীরা তাঁকে পরিত্যাগ করেন। পরে এক মুসলমানের দয়ায় তাঁর জীবন ফিরে পান এবং মাতা-পিতা ও স্ত্রী সহ সমগ্র হিন্দু সমাজ তাঁকে পরিত্যাগ করে। জীবনদাতা ও প্রতিপালক সিরাজ সাঁই তাঁর দীক্ষাগুরু। এও বলা হয় যে, ১১২ থেকে ১১৬ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বিষয়হীন ফকির ছিলেন না। নগদ প্রায় ২০০০ টাকা রেখে তিনি মারা যান। এই সম্পত্তির কতক তাঁর স্ত্রী, কতক ধর্মকন্যা, কতক অন্যতম শিষ্য শীতলকে ও কতক সৎকার্যে ব্যয় করার পরামর্শ দিয়ে যান।

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ার লালন অ্যাকাডেমির পরিচালক অধ্যাপক আনোয়ারুল করীমের লেখা থেকে ফকির লালন শাহ্ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারা যায়। অন্নদাশংকর রায় ও কর্মরত অবস্থায় কুষ্টিয়া জেলার কালীগঙ্গা নদীর ধারে ছেঁউড়িয়ায় লালনের আখড়া দেখেছেন।

মহম্মদ মনসুর উদ্দীনের লোকসংগীত সংগ্রহ 'হারামণির' জন্য আমরা লালনকে আজ বুঝতে পারি। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে রবীন্দ্রনাথও লালনকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেত সাহায্য করেন। অধ্যাপক ডিমক তো লালনের মত রবীন্দ্রনাথকেও 'বাউল' আখ্যা দিয়েছেন। কিংবদন্তি— লালন নাকি প্রায় ১০ হাজার গান রচনা করেছিলেন। হাজার খানেক গানের সন্ধান মেলে। তিনি বা তাঁর শিষ্যরা গান সংরক্ষণ পছন্দ করতেন না। লালন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের ধারণা— বাউল তত্ত্ব একমাত্র বাউলদের কাছ থেকেই শেখা যায়। তাঁরা বলতে চান 'লিখে নিলে ঝর্ণার জলকে বেঁধে রাখা হয়। ওকে বয়ে যেতে দাও। ভিতর থেকে নতুন ধারা ঝরবে।'

বর্তমানের এই LP.G (L= Liberalisation, P= Privatisation, G= Globalisation) শাসিত দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে শিক্ষাকে যেভাবে পণ্য করে তোলা হচ্ছে তাতে আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। এমন ধারা শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতশিক্ষায় যে চিত্তমুক্তির কথা বলেছিলেন তার সম্ভাবনাও নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। মানুষে-মানুষে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, সম্প্রদায়-সম্প্রদায়ে ব্যবধান বাড়িয়ে চলবে এই শিক্ষা। 'জ্ঞান নেই আজ পৃথিবীতে; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই'— জীবনানন্দ দাশ। অথচ স্কুল-কলেজের প্রথ্যাগত শিক্ষা না পেয়েও জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোত্তম শিক্ষার অধিকারী মানবপ্রেমিক লালন অকপটে বলতে পেরেছেন—

সবে বলে লালন ফকির. হিন্দু কি যবন
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।

....

বিবিদের নাই মুসলমানি
পৈতা যার নাই সেও তো বামনী

এই স্বভাব কবির সত্য দর্শনকে পাথেয় করেই মানুষকে আজ চলতে হবে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের পটভূমিকায় লালনের বাণী আজ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। দাদু, কবীর, রজ্জব, মীরাবাঈ, তুকারাম, রুইদাস ও নানকের পাশাপাশি লালন চর্চা ও লালন গীতির মর্মার্থ অনুধাবন করেই আমরা মারামারি, হানাহানির ঊর্ধ্বে উঠতে পারি।

সমগ্র বিশ্বে তুচ্ছ জাতি-চিন্তা যে কত মানব জীবন অকালে ঝরিয়ে দিচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব, খ্রিস্টান, ইহুদি, জৈন, পার্সিদের দ্বন্দ্ব, হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব, প্রতিটি জাতির অভ্যন্তরস্থ অসংখ্য উপজাতির দ্বন্দ্বে সারা পৃথিবী ক্ষতবিক্ষত। জাতের নামে বজ্জাতি চলছে দুনিয়া জুড়ে। বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে— 'আমাদের যে ডোম সেও সগর্বে বলে 'আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ড ম্ ম্ ম্ ম্।' সবাই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। অল্প কথায় ন্যায়-নীতির বিসর্জন দেওয়া এক হৃদয়হীন মানব সমাজকে আমরা চোখের সামনে দেখছি। একদিন চন্ডীদাস শিখিয়েছিলেন: 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। লালন আরও স্পষ্ট করে বলেন—

'এই মানুষে সেই মানুষ আছে'

অথবা

'মানুষ অবিশ্বাসের পাইনে রে সেই মানুষ নিধি
এই মানুষে মিলত মানুষ চিনতাম যদি।'

হোক না আধ্যাত্ম তত্ত্বের কথা, হোক না সাধন তত্ত্বের কথা কিন্তু সেই সাধনায় 'সর্বোত্তম মানুষ লীলা', সেই মানুষ 'সোনার মানুষ'।

মানুষ, মানুষ। হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খ্রিস্টান নয় শুধুই মানুষ। মানুষের ধর্মই (The Religion of Man) ছিল তাঁর ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড বক্তৃতায় লালনকে উপনিষদের ঋষির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায় লিখছেন— 'এক বৈষ্ণবী, সেও বাউল, একবার আমায় বলেছিল, বাবা, মানুষই একমাত্র সত্য। মানুষ ছাড়া আর কিছুই নেই। এই মানুষই রাম হয়ে রাবণকে মেরেছিল। এই মানুষই রাবণ হয়ে সীতা হরণ করেছিল। এই মানুষই কৃষ্ণ, এই মানুষই কংস। এই মানুষই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা। এই মানুষই সব।'

হতে পারে আধুনিক যুগের হিউম্যানিজম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গেই জড়িত, তাই বলে কি চন্ডীদাস-লালনের মানবিকবাদ নস্যাৎ হয়ে যাবে। আর সেজন্যই বর্তমান যুগে লালনচর্চার প্রয়োজনীয়তা। অন্নদাশঙ্কর রায় যথার্থই বলেছেন— 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য যাঁরা ব্যাকুল তাঁদের কাছে লালনের গান অমৃত সমান।' একই কথা ডঃ আহম্মদ শরীফের ভাষায়—

'ভেদ বুদ্ধিহীন মানবতার উদার পরিসরে সাম্য ও প্রেমের সু-উচ্চ মিনারে বসেই লালন সাধনা করেছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধক ও দার্শনিকদের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি সাম্য ও প্রেমের বাণী শুনিয়েছেন।'

প্রকৃতপক্ষে লালন সাঁই ('শাহ্' শব্দের প্রতিশব্দ 'সাঁই'; লালনের কবিতার 'সাঁই' মনের মানুষ) একাধারে কবি, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা ও প্রেমিক। লোকসংস্কৃতির অন্যতম স্রষ্টা, ধারক ও বাহক লালন শুধু ব্যক্তি নাম নয়, লালন একটি ঐতিহ্যের নাম।

রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের মত এপার বাংলা-ওপার বাংলায় অবিভাজ্য এই লালন-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে এগিয়ে যাওয়াই হোক আমাদের অন্বিষ্ট।

'গান্ধারীর আবেদনে' ধৃতরাষ্ট্র

আকারে নাটক প্রকারে কাব্য 'গান্ধারীর আবেদনে' রবীন্দ্রনাথ বোধ করি সজ্ঞানে গান্ধারীকেই 'নায়ক' করতে চেয়েছিলেন কিন্তু নির্জ্ঞানে ধৃতরাষ্ট্রই তাঁর সমগ্র কল্পনাকে অধিকার করে এই কাব্যনাট্যের কেন্দ্রস্থলে বিরাজমান।

কাহিনী-রীতি ও নাটকীয়-রীতির মিশ্রণে গঠিত এই কাব্যে গান্ধারী নিঃসন্দেহে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি অংশ জুড়ে রয়েছেন; তাঁর ভাষণও চিত্তাকর্ষক। তিনি একের পর এক প্রথমে রাজার কাছে, পরে অবাধ্য স্বৈরাচারী পুত্র দুর্যোধনের কাছে এবং সর্ব্বশেষে বিধাতার কাছে, তাঁর আবেদন রেখেছেন। কিন্তু কাব্যে তাঁর আবেদনও যেমন নিষ্ফল, 'নায়ক' চরিত্রেও তিনি তেমনই বেমানান।

স্বীকার করি, তাঁর ভাষণ (বা অতিভাষণ) পাঠকের প্রশংসা অর্জন করেছে; স্বীকার করি পাপিষ্ঠ স্বৈরশাসক দুর্যোধন আদর্শ জননী গান্ধারীকে রীতিমত ভয় পায়; স্বীকার করি যুক্তিবাদিনী গান্ধারীর কাছে রাজা ধৃতরাষ্ট্রও যুক্তি হারিয়ে মূক থাকতে বাধ্য হন; দ্রৌপদী সহ পঞ্চপান্ডব পঞ্চমুখে তাঁরই প্রশংসা গান এবং তাঁরই আশীর্ব্বাদের জন্য উদগ্রীব থাকেন এও স্বীকার করতে হয়, তথাপি অপেক্ষাকৃত অপ্রধান চরিত্র অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রই এই কাহিনীর নায়কত্ব দাবি করতে পারেন।

কবি নিজে হয়তো গান্ধারী চরিত্রকে পাঠকের সমবেদনার প্রধান অংশীদার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রই পাঠকের pity বা সমবেদনার সবটুকুই আদায় করে নিয়েছে। ট্র্যাজেডির যে দ্বন্দ্বজাত বেদনা কোন চরিত্রকে নায়কের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর একান্ত অভাব গান্ধারী চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। যিনি বুদ্ধি বিচারের দিক দিয়ে কোন ভ্রম করেন না, যিনি প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণায় কোন গর্হিত কর্ম করেন না— যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে বিগতস্পৃহ তাকে 'মুনি' বলা চললেও ট্র্যাজেডির নায়ক বলতে স্বয়ং Aristotle-ই আপত্তি জানিয়েছেন। বিশেষতঃ তিনি যদি পাঠকের স্বতস্ফূর্ত সমবেদনা জাগাতে অসমর্থ হন তাহলে তো কথাই নেই। রাজমাতা গান্ধারীর কথায় কেমন যেন নীতির গন্ধই বেশি। তাই সেখানে 'সমবেদনা' অপেক্ষা নীতিবোধের পীড়াই প্রাধান্য লাভ করেছে। অপর পক্ষে, পিতা ধৃতরাষ্ট্রর মধ্যে ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্বজাত বেদনা পুরোমাত্রায় পরিস্ফুট। Aristotle ট্র্যাজেডির নায়ককে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এক শ্রেণীর নায়ক does something terrible; এরা আক্রমণপ্রবণ বা সক্রিয়। অপর শ্রেণীর নায়ক suffers something terrible, এঁরা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকেন; এঁরা আপাতঃদৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় বা passive। ধৃতরাষ্ট্র হয়তো সেক্সপীয়রের রাজা Lear-এর মতো এই দ্বিতীয় শ্রেণীতেই পড়বেন তবু একথা তো আজকের দিনে সত্যি যে শুধু দৈহিক উদ্যম নায়কের সক্রিয়তা নিষ্ক্রিয়তা বিচার করে না। মানসিক ক্রিয়াও নায়কের সক্রিয়তা

নির্ধারণে সক্ষম। সত্য বটে এই শ্রেণীর চরিত্রে doing অপেক্ষা suffering-এর ভাগ বেশি তবুও এই suffering রাজা Lear কে ট্রাজিক চরিত্রে পরিণত করেছে; এই suffering ও বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শুভ্রশীর্ষে ট্রাজেডির স্বর্ণমুকুট পরিয়েছে।

ট্র্যাজেডির সূত্রে আছে— ট্র্যাজেডির নায়কের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটবে নায়কের বিচার বিভ্রমের অথবা অন্তর্নিহিত কোন প্রবৃত্তি বা দুর্ব্বলতার ফলে। গান্ধারী চরিত্রে এ দুর্ব্বলতা নেই ; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রের অত্যধিক স্নেহপ্রবণতা বা পুত্রস্নেহরূপ দৌর্বল্যই তাঁকে নায়কের মহিমায় বিভূষিত করেছে।

> "অন্ধ আমি। অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
> চিরদিন"।

ধৃতরাষ্ট্র সম্পর্কে সব কথাই তো তাঁর নিজের এই উক্তিতেই বলা হয়ে গেল না কি? জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র স্নেহান্ধও বটে এবং তাঁর এই স্নেহান্ধ প্রকৃতিই তাঁকে ট্র্যাজিক চরিত্রের মহিমায় মহিমান্বিত করেছে। যেমনটি দেখেছি দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের সাজাহান চরিত্রে। বৃদ্ধ পিতা সাজাহানের মত ধৃতরাষ্ট্রের দুই সত্তা। এক, সম্রাটসত্তা, দুই পিতৃসত্তা। সাজাহানে যেমন সম্রাটসত্তাকে পিতৃসত্তার কাছে সম্পূর্ণ পরাভব মানতে দেখেছি, ধৃতরাষ্ট্রও অনুরূপ ভাবে স্নেহান্ধ পিতৃসত্তা সম্রাটসত্তার উপর সম্পূর্ণ জয়ী হয়েছে। তাই যখন জননী গান্ধারী সামান্য প্রজার মত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করেছেন রাজসত্তা পশ্চাৎমুখী হয়ে বধির হয়ে থাকার চেষ্টা করেছে।

সাধ্বী জননী গান্ধারীর কাতার উক্তি—

> মহারাজ, শুন মহারাজ,
> এ মিনতি— দূর করো জননীর লাজ,
> বীরধর্ম্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
> সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত
> ন্যায়ধর্মে করহ সম্মান, ত্যাগ করো
> দুর্যোধনে।

উত্তরে ধৃতরাষ্ট্র পূণ্যভীত দুর্যোধনকে পরিত্যাগের পরিবর্তে শুধু বলেছেন—

> 'পরিতাপ দহনে জর্জ্জর
> হৃদয়ে করিছ শুধু নিষ্ফল আঘাত
> হে মহিষী।'

'ত্যাগ করো পাপী দুর্যোধনে।'— গান্ধারীর এই অনুরোধের উত্তরে ধৃতরাষ্ট্র বলেন—

পাপী পুত্র ত্যজ্য বিধাতার, তাই তারে ত্যজিতে না পারি— আমি তার একমাত্র।

একেই বলে অন্ধ পুত্রস্নেহ। এই স্নেহের বশে তিনি বিনাশের তলে তলিয়ে যেতেও রাজি আছেন। এই স্নেহই তাঁকে পাপী দুর্যোধনকে ক্ষমা করতে বাধ্য করেছে।

> এই মত পাপবুদ্ধি পিতৃ স্নেহরূপে
> বিঁধিতে লাগিল মোর কর্ণে চুপে চুপে
> কত কথা তীক্ষ্ণ সূচিসম।

জননী গান্ধারী তাঁকে বারবার ন্যায়ের দোহাই দিয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে পুণ্যের দোহাই দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন কিন্তু পুত্রস্নেহাতুর ধৃতরাষ্ট্র অচল অটল। তাঁর জন্য তাঁর যুক্তি—

ধর্মবিধি বিধাতার—
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্ম্মদন্ড তাঁর
রয়েছে উদ্যত নিত্য— অয়ি মনস্বিনী,
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য করিবেন তিনি।
আমি পিতা—

অথচ ধৃতরাষ্ট্র প্রথম দিকে দুর্যোধনকে ফেরাতে চেষ্টা করেননি তা নয়। তিনি দুর্যোধনকে দুর্মতি বলে কটূক্তি করেছেন। ভ্রাতৃদ্রোহী বলে বিদ্রূপ করেছেন ; কপটদ্যূত ক্রীড়ায় পান্ডবদের পরাজিত করার জন্য নির্লজ্জ অহংকারী বলে নির্ম্মমভাবে আঘাত হানার চেষ্টা করেছেন কিন্তু যখন দেখেছেন যে দুর্যোধনকে রাজধর্ম্ম, ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম সব কিছুকে বিসর্জ্জন দিয়ে জয়ধর্ম্মকে বরণ করতে চেয়েছেন তখন অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের অপকর্ম্মের জন্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছেন, নিজেকে বিবেকের দংশনে ক্ষত বিক্ষত করেছেন। তখন কপট ঔরংজেবের মত কপট দুর্যোধন যখন ছলনা করে তাঁর ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বলেছেন—

তবে ক্ষমা দাও পিতৃদেব, নাহি কাজ
সিংহাসন কন্টক শয়নে— মহারাজ,
বিনিময় করে লই পান্ডবের সনে
রাজ্য দিয়ে বনবাস, যাই নির্ব্বাসনে।

তখন পিতা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে অধার্মিক জেনেও ক্ষমা না করে পারেননি।

"এত স্নেহ। করিতেছি সর্ব্বনাশ তোর"— বিবেকের দংশনজাত এই অন্তর্দ্বন্দ্বই তাঁকে ট্রাজিক মহিমায় ভূষিত করেছে। গান্ধারী চরিত্রে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কই? তিনি গর্ভধারিণী হয়েও ন্যায়কে, ধর্ম্মকে, পুণ্যকে পরিত্যাগ করতে পারেননি ; পুত্র দুর্যোধন রাজা হলেও রাজমাতা এই বিশেষণে তিনি আদৌ সন্তোষ পান না কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সর্বদোষযুক্ত পুত্রের সমস্ত দোষ ক্ষমা করে বলতে পেরেছেন—

হও জয়ী, হও সুখী। হও তুমি রাজা একেশ্বর।....
আজি জয়োৎসবে
ন্যায় ধর্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি রবে—
না রবে বিদুর ভীষ্ম ; না রবে সঞ্জয়,
নাহি রবে লোকনিন্দা লোকলজ্জা-ভয়,
কুরুবংশ রাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর—
শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার,
আর কালান্তক যম— শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ, আর নহে কেহ।

এখানেই তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব, এখানেই তাঁর পিতৃসত্তার জয়। এখানেই তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বমথিত বেদনা— এবং এখানেই তিনি গান্ধারীর আবেদন কাব্য-নাট্যের নায়ক।

চন্ডালিকা : অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মানবিকতার জেহাদ

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত The Sanskrit Bhuddhist Literature of Nepal গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের চন্ডালিকা নাটকটি গ্রথিত। এই কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন। প্রকাশের চার বছর পর কবিদ্বারা নাটকটি চন্ডালিকা নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হয়।

রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত নেপালি বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দূলকর্ণাবদানের যে বিবরণ আছে তা থেকে জানা যায় গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথ শিশুদের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন এক চন্ডালের কন্যা নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলেন। সে জল দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হল। তাঁকে পাবার জন্য কোন উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইল। মা তার যাদুবিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদি প্রস্তুত করে সেখানে আগুন জ্বালালো এবং মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে একে একে একশ' আটটি অর্কফুল সেই আগুনে ফেলল। আনন্দ এই যাদুর শক্তিরোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তাঁর বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদির উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হল। পরিত্রাণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধ মন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চন্ডালের বশীকরণ বিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন। ঐতিহাসিক উইন্টারনিটজের A History of Indian Literature-এর Vol. 2-তে কাহিনীর যে বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে রবীন্দ্রনাথ সরে এসেছেন। উইন্টারনিটজ লিখেছেন One day when he (Ananda) was returning from the town, he was thirsty and saw a Chandala girl named Prakriti, fetching water from the well. "Sister", He said to her, "give me some water to drink." তবে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীতে আনন্দের সঙ্গে প্রকৃতির বিরহের কথা নেই। কিন্তু ঐতিহাসিকরা বলছেন, Buddha sends for Prakriti and appears to agree to her desire of marrying Ananda, but with great delicacy, he is able to induce her to take the vow of chastity and become a nun. এই ঘটনা শুনে শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা এবং জনপদগণ ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা প্রসেনজিৎকে বুদ্ধের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। সমবেত নাগরিকদের কাছে বুদ্ধ চন্ডাল প্রধান ত্রিশঙ্কুর গল্প বললেন। এই ত্রিশঙ্কু অহংকারী ব্রাহ্মণ পুষ্করাসারীন-এর কন্যার সঙ্গে তার পন্ডিত পুত্র শার্দূলকর্ণের বিবাহের কথা বলে। ব্রাহ্মণ তা প্রত্যাখ্যান করলে 'Trisanku severely

criticises the caste system and the Brahminical ethical Teachings' সেই জন্মে বুদ্ধ ছিলেন ত্রিশঙ্কু, শার্দূলকর্ণ ছিলেন আনন্দ এবং প্রকৃতি ছিলেন ব্রাহ্মণকন্যা। ভাগ্নার এই কাহিনীর উপর নির্ভর করে পার্সিফল (Parsifal) রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনীতে প্রধান প্রতিপাদ্যও সকল মানুষই সমান। অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে। তাই দেখা যায় ফুলওয়ালীর দলও ঘৃণা করে প্রকৃতিকে ফুল না দিয়ে চলে গেল। চন্ডালকন্যা দই কিনতে চাইলে একজন মেয়ে সাবধান করে দিল।

ওকে ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, ছি / ও যে চন্ডালিনীর ঝি— / নষ্ট হবে যে দই / সে কথা জান' না কি!

চুড়িওয়ালাও তাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে যায়।

কিন্তু বুদ্ধশিষ্য আনন্দ যখন বলে

'যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা। / সেই বারি তীর্থ বারি / যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে, / যাহা তাপিত শ্রান্তেরে স্নিগ্ধ করে / সেই তো পবিত্র বারি। / জল দাও আমায় জল দাও।' তখন আনন্দের অশ্রু বয়ে যায় চন্ডালকন্যার চোখে।

আনন্দই তাকে শিখিয়েছে—

'মানবের বংশ তোমার / মানবের রক্ত তামার নাড়িতে।'

এই নতুন বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রকৃতি অনুভব করে—

'এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম, / নতুন জন্ম আমার।'

স্বাভাবিক ভাবেই মানবী চন্ডালিকা আনন্দকে পতিরূপে পেতে চেয়েছে এবং মার যাদুকরী বিদ্যার সাহায্য পেয়েছে। এই বিষয়ে সৈয়দ ইদ্রিস তাঁর 'ওরিয়েন্টাল ম্যাজিক' বইতে লিখেছেন, "Magic mirrors are among the most important instruments of the Art in China." রবীন্দ্রনাথ 'সোনারতরী' কাব্যের বিম্ববতী কবিতায়ও মায়াময় কালদর্পণ-এর কথা বলেছেন—

রাজকন্যা বিম্ববতী সতীনের মেয়ে,/ধরা তলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে।' কালদর্পণে এই মুখ দেখে 'সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী সে ধরায় বিরাজে' এই সত্যান্বেষণে মহিষীর বুক বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অহংকার তার গেছিল চূর্ণ হয়ে। প্রকৃতির মার যাদুবিদ্যা অবশ্য সফল হয়। তবে নৃত্যনাট্য চন্ডালিকার কাহিনীর শেষাংশে আনন্দের পরাজয় দেখানো হয়নি। বুদ্ধ তাঁকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ মানবধর্মের উপর জোর দিয়েই চন্ডালিকা নৃত্যনাট্য লিখেছেন। নাচ-গানের আড়ালে আমরা যেন এই মূল সত্যটি বিস্মৃত না হই। আনন্দের ম্লান, ক্লান্ত আত্মপরাজয়ের মূর্তিকে দেখাতে ও দেখতে চায়নি মানবী চন্ডালিকা। চন্ডালিকা নাটিকায় প্রকৃতি নিজেই তার মাকে বলেছে, 'অপমান করিসনে বীরের, জয় হোক তাঁর জয় হোক।' এ জয় আনন্দের জয়, এ জয় কল্যাণী চন্ডালিনীর জয়, এ জয় মনুষ্যত্বের জয় এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিবাদ। 'যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা' আনন্দের এই বাণী রবীন্দ্রনাথেরই বাণী। আর তাই চন্ডালিকা শুধু বৌদ্ধ কাহিনীর নিছক অনুসরণ নয়, হিংসায় উন্মত্ত জাতিভেদ জ্বরাক্রান্ত এই যুগের পটভূমিকায়ও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও রবীন্দ্রনাথ

সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, উগ্রজাতীয়তাবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ জনগণের শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু এবং সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। দুঃখের কথা, স্বাধীনতা প্রাপ্তির এত বৎসর পরেও এই সব সমস্যা ভারতবর্ষকে তীব্রভাবে নাড়া দিচ্ছে।

১২৫ তম জন্মবর্ষপূর্তিতে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা চলছে এই ভারতবর্ষে, যে ভারতবর্ষে বর্তমানে ঝাড়খন্ডী, গোর্খাল্যান্ড, কামতাপুরের আন্দোলন উত্তাল তরঙ্গ তুলেছে। স্বভাবতই কৌতূহল জাগে রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে এইসব আন্দোলনকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন। অথবা রবীন্দ্রসৃষ্টির আলোকে এইসব সমস্যার সমাধানের কোন সংকেত পেতে পারি কিনা। এগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক চিন্তা।

সারা ভারতবর্ষে জুড়ে যে সব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দেখা দিয়েছে তার কোন একটির সঙ্গে অপরটির হুবহু মিল নেই। তবে এগুলির উৎস অনেকাংশে ঘৃণা, উপেক্ষা ও ভুল বোঝাবুঝি। কিন্তু এই সব আন্দোলন ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা এবং সংকীর্ণ মনোভাব, জাতিবিদ্বেষ, ধর্মেধর্মে লাঠালাঠি, উচ্চ নীচ ভেদাভেদ এই সব আন্দোলনের মূলে একথা ভুললে চলবে না। একথাও ভুললে চলবে না শুধু আইন করে বা রাজনৈতিক স্লোগান দিয়েই এইসব সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে সমাধান হবে। এইসব আন্দোলনের পিছনে আছে জটিল সাংস্কৃতিক সমস্যা। আর বলা বাহুল্য সাংস্কৃতিক সমস্যা একদিনেই মেটানো যায় না।

ভারতবর্ষের উপরিলিখিত এই সমস্যার চেহারার দিকে তাকিয়ে একথা অবশ্যই নির্দ্বিধায় বলা চলে যে বাঙালি হয়ে জন্মালেও সংকীর্ণ বাঙালি বা হিন্দুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের ছিল না। তিনি বাঙালি হয়েও মনেপ্রাণে ভারতীয় ছিলেন এবং জীবনের শেষ লগ্নে মনেপ্রাণে বিশ্বপথিক হয়ে উঠেছিলেন।

ভারততীর্থ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের যে আহ্বান—

এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃস্টান।

এই আহ্বানের আন্তরিকতা সম্পর্কে কোন সংশয় পোষণ করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত এবং অশোভনও বটে। সত্যি সত্যিই এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে তিনি শুধু ভারতবাসীকে নয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বমানবকে উদাত্ত আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

প্রায় সমকালে রচিত জনগণ-মন-অধিনায়ক জাতীয় সংগীতেও মহামিলনের আহ্বান বাণী ধ্বনিত হয়েছে।

'অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীস্টানী—
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা!

যে ভারতবর্ষের মর্মবাণী বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সেই ভারতবর্ষের প্রাণের কথাই কি বিবৃত হয়নি 'হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীস্টানী' এই ছত্রের মধ্যে। 'পূরব পশ্চিম' অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন তো বিশ্ববোধেরই ব্যাপার।

'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে ভারতপথিক রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে রবীন্দ্র লিখেছেন—

এখানে নানা জাতের লোক একত্র এসে জুটেছে। পৃথিবীতে অন্য কোন দেশে এমন ঘটেনি। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে। এই হল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থার নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়। ইতিহাস মাত্রেরই সর্বপ্রধান মন্ত্র হচ্ছে সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্— এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব। সকলের মনকে এক বলে জানব। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দুরূহ এমন আর কোনো দেশেই নয়। যতই দুরূহ হোক এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোন পথ নেই।

স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে এবং এই সাধনা দুরূহ। আর দুরূহ বলেই যথোপযুক্ত দৃষ্টির অভাবে উপযুক্ত নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাবে বর্তমান ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হতে চাইছে। যে মহাজাতীয়তা বোধ থাকলে এই ঐক্যবন্ধন সম্ভব নানা কারণে আমরা তা থেকে সরে এসেছি। কীভাবে আবার তা ফিরবে তা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ভাবতেই হবে। তবে একটা কথা অস্বীকার করে উপায় নেই যে, যে জিনিসটা যখন ভাবা দরকার তা আমরা ভাবিনা। ফলে অতি ক্ষুদ্র সমস্যা বৃহদাকার ধারণ করে এবং তখনই সে আমাদের নজরে পড়ে। যদিও একথা সবাই জানেন যে সমস্যার জটিলতা বাড়ার আগে তার সমাধান সহজতর।

যেমন এই ভারতবর্ষে অনেক সময় হিন্দুমুসলমান সমস্যা, হিন্দু শিখ সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হয়। অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বাস্তববাদী মত রেখেছেন 'লোকহিত' প্রবন্ধে।

'সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, ঘরে যখন আগুন লাগিয়েছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার প্রায়োজন বৃথা। বঙ্গ বিচ্ছেদের দিনে হঠাৎ যখন মুসলমানকে আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমরা সেই কূপ খননেরও চেষ্টা করি নাই— আমরা মনে করিয়াছিলাম মাটির উপরে ঘটি ঠুকলেই জল আপনি উঠিবে। জল যখন উঠিল না, কেবল ধূলাই উড়িল তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না। আজ পর্যন্ত সেই কূপ খননের কথা ভুলিয়া আছি। আরো বারবার মাটিতে ঘটি ঠুকিতে হইবে সেই সঙ্গে সে ঘটি আপনার কপালে ঠুকিব।'

অন্যত্র ও রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন যে মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভেবে দেখার বিষয়, কে লাগাল ততটা গুরুতর বিষয় নয়। অনুরূপভাবে আজ রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই বলতেন যে, শিখেরা যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে লাগতে পারে সেটাই ভাবার বিষয় এর পেছনে বিদেশি গন্ধ আছে কিনা সেটা তো পরের কথা। কামতাপুরের রাজবংশীরা কেন বর্ণহিন্দুদের কাছে ঘৃণিত 'বাহে' শব্দের দ্বারা বিশেষিত হয়, সে খবর অনেক আগেই রাখা উচিত ছিল।

বস্তুতঃ এই সমস্ত আন্দোলনের পেছনে যে মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে বা থাকে বর্তমানে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সত্যি সত্যিই বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে কিনা দেখবে কে? রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেন 'শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না; অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সন্ধানেই সাবধান হইতে হইবে। অস্বীকার করে লাভ নেই স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমরা ছিদ্র সন্ধানে যথেষ্ট মনোনিবেশ করতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী আমরা অনুধাবন করতে পারিনি।

'হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো—
ভেদচিহ্নের-তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে। (পত্রপুট, পনেরো)

অথচ এই সংকীর্ণতা মুক্ত হতে না পারলে রবীন্দ্রনাথের কোন গোরা জোরের সঙ্গে বলতে পারবে না—

আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান কোনো সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দুমুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই— যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনোজাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয়না— যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।'

আজ গোরার এই মত প্রতিটি ভারতবাসীর মত হবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বহুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার কথা ভেবেছিলেন এবং "হিন্দু মুসলমান" প্রবন্ধে স্পষ্ট করেই বলার চেষ্টা করেছিলেন যে অনেক সময় মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরা অনেক বেশি রক্ষণশীল হয়ে থাকেন এবং হিন্দু মুসলমান সার্থক মিলনের জন্যে প্রয়োজন উভয়পক্ষের মানস প্রকৃতির অবরোধ দূর করা। তিনি দৃঢ় কণ্ঠেই বলেছিলেন যে শিক্ষার দ্বারা সাধনার দ্বারা এই অবরোধ দূর করতে হবে এবং বুঝতে হবে সকলকে। 'ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো' এই সংস্কারটা কোনদিন জয়ী হতে পারেনা, হওয়া উচিত নয়। যে দেশে প্রধানতঃ ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায় রবীন্দ্রনাথ সে দেশকে হতভাগ্য আখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁর মতে প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি হলো 'মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজপ্রীতির সঙ্গে স্বীকার করা।' নাহলে পলিটিক্সের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে বড় জোর "তালি-দেওয়া মিল' হতে পারে কিন্তু সে মিলে চিরকালের প্রয়োজন টিকবে না। রবীন্দ্রনাথের সেই সতর্কবাণী আমরা শুনিনি বলেই আজ আমাদের এই দুর্দশা।

নাম ভাবনায় পল্লীসমাজ

জানুয়ারি, ১৯১৬-তে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ উপন্যাস তাঁর উপন্যাস ধারায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কী এই বিশিষ্টতা? 'পল্লী' শব্দের সঙ্গে 'সমাজ' যুক্ত বলে?

সাহিত্য বিশেষতঃ উপন্যাস তো সমাজেরই দর্পণ! তাই উপন্যাসে সমাজচিত্রণ তো থাকবেই— তা লেখকের জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক। আর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সব গল্প উপন্যাসেই তো জ্ঞাতসারে সমাজের প্রতিফলন আছেই। বড়দিদি কি বিরাজ বৌ, অরক্ষণীয়া কি বামুনের মেয়ে, গৃহদাহ বা চরিত্রহীন, পথের দাবী বা শেষ প্রশ্ন সকলের সম্পর্কেই কথাটা সমান ভাবে প্রযোজ্য। তবে পল্লীসমাজ কোনদিক থেকে ব্যতিক্রম?

সংসারে বঞ্চিত, দুর্বল, লাঞ্ছিত উৎপীড়িতদের জন্য পরিকল্পিতভাবে লেখনী ধারণ করে যে শরৎচন্দ্র 'মানুষের কাছে মানুষের নালিশ' জানাবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তার উপন্যাসে সমাজ তো থাকবেই। তাহলে আলাদাভাবে 'পল্লী সমাজ' নাম দিয়ে আলাদা উপন্যাস লেখার সার্থকতা কোথায়?

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নামকরণের প্রচলিত তিন রীতি মূলতঃ আমরা লক্ষ্য করে থাকি; এক, চরিত্রভিত্তিক, দুই বিষয়বস্তুভিত্তিক; তিন, ভাববস্তুভিত্তিক নামকরণ। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়, পল্লীসমাজ বিষয়বস্তুভিত্তিক নামকরণ ছাড়া কিছু নয়। আমার ধারণায় 'পল্লীসমাজের বিশিষ্টতা এইখানে যে, ওটা নিছক বিষয়ভিত্তিক নামকরণ নয়। বিষয়বস্তু যে সময় সময় চরিত্র হয়ে উঠতে পরে এটি তার সার্থক উদাহরণ। তাঁরসব উপন্যাসে সমাজ শক্তির উল্লেখযোগ্য একটা ভূমিকা থাকলেও তিনি ধারণা করেছিলেন যে পাঠককে শুধু চরিত্রমনস্ক না করে সমাজমনস্ক করার জন্য অন্ততঃ তাঁর একটা গ্রন্থের নামকরণ 'পল্লীসমাজ' হওয়া উচিত। তাই ইচ্ছাকৃত ভাবেই তিনি উপন্যাসটির নাম 'রমা', 'রমেশ' 'বেণীর দলাদলি' না দিয়ে পল্লী সমাজ দিয়েছেন, রমা, রমেশ, বেণী, গোবিন্দ গাঙ্গুলী বা জ্যাঠাইমা পল্লীসমাজের অংশ বিশেষ। এখানে অংশের থেকে লেখকের নজর ছিল সমগ্রের দিকে বেশি। স্বাভাবিকভাবেই অংশেরচেয়ে সমগ্র প্রাধান্য পেয়েছে এবং লেখকের প্রধান কৃতিত্ব শুধু তৎকালীন পল্লীসমাজের হুবহু বর্ণনাই নয়। এই পল্লীসমাজ রমা, রমেশ, বেণী, জ্যাঠাইমার মত স্বতন্ত্র একটা চরিত্র হয়ে উঠেছে। নিবিষ্টমনে উপন্যাসে কান পাতলে এই সমাজের হৃৎস্পন্দন পাওয়া যায় এবং এর রুচি, আচার, ক্রোধ, ভালবাসা, শাসন সব কিছুই আলাদা করে দেখতে পাওয়া যায়। অন্য উপন্যাসে সমাজ পটভূমিকা মাত্র; কিন্তু এখানে সে বেণীর সঙ্গে গলাগলি করে চলে, জ্যাঠাইমাকে উপদেশ দিতে বলে, রমেশের মনে ক্ষণে ক্ষণে ভাঙন ধরায়, রমার চোখের জল ঝরায় এবং সম্ভবতঃ পাঠককে বলতে চায়— এই আমার চেহারা; তোমরা বদলাতে চাও বদলাও, না হলে কুছ পরোয়া নেই।

আর যদি পল্লী সমাজ নিজেই এখানে চরিত্র হয়ে থাকে এবং যে চরিত্রকে কেন্দ্র করে গোটা উপন্যাসের বিষয়বস্তুর পরিক্রমণ তাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলতেও বোধ হয় আপত্তি থাকা উচিত নয় এবং সেদিক থেকে এই উপন্যাসের নামকরণ অনেক বেশি সহজ, সরাসরি এবং পাঠকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ যুক্ত। এই উপলব্ধির স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ দেবার চেষ্টা করা যাক।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য সমবেত ধর্মদাস হালদার, গোবিন্দ গাঙ্গুলি, ভৈরব আচার্য ইত্যাদি অপ্রধান চরিত্রগুলি শরৎচন্দ্রের লেখনী স্পর্শে অত্যন্ত সজীব হয়েছে। কিন্তু এঁরা এঁদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না করেও মূলতঃ পল্লীসমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপেই চিহ্নিত, এধারণা অমূলক নয়। এই সমাজ ন্যায় অন্যায় বিচার করেনা, এরই হীনতম মনোবৃত্তির ফলে বেণী ও গোবিন্দ সমাজপতি আর রমেশ এক ঘরে।' এর বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যেও যদি কোন সামঞ্জস্য থাকে তো স্বার্থসিদ্ধির প্রতিযোগিতায় কে প্রথম স্থান দখল করতে পারে তা নিয়ে এরা ব্যস্ত। যেমন গোবিন্দ গাঙ্গুলি অসহায় রমেশকে বলে, ''ভিতরে বুঝি ধর্মদাস-গিন্নী এসেচে? খবরদার, খবরদার, অমন কাজটি করোনা বাবা? বিট্‌লে বামুন যতই ফোসলাক, ধর্মদাস গিন্নীর হাতে ভাঁড়ারের চাবি-টাবি দিওনা বাবা, কিছুতেই দিওনা— ঘি, ময়দা, তেল, নুন, অর্ধেক সরিয়ে ফেলবে। তোমার ভাবনা কি বাবা? আমি গিয়ে তোমার মামীকে পাঠিয়ে দেব। সে এসে ভাঁড়ারের ভার নেবে, তোমার একগাছি কুটো পর্যন্ত লোকসান হবে না।'

শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পল্লী সমাজ প্রসঙ্গে একস্থানে মন্তব্য করেছেন— 'বিদেশী ও বিধর্মীর অবিশ্রান্ত আক্রমণ যে পুঞ্জীভূত ঔদাসীন্য ও জড়তার গন্ডার-চর্ম স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই' লেখক শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে তা পেরেছেন। বস্তুতঃ ধর্মদাস বনাম গোবিন্দ গাঙ্গুলির পারস্পরিক অবিশ্বাস ও স্বার্থপরতা থেকে জড়তার গন্ডার-চর্ম বস্তুটি কি চিনে নিতে বোধ করি কষ্ট হয় না।

অবশ্য তৃতীয় পরিচ্ছেদে দীনু ভট্টাচার্যের আচরণ রমেশকে খুব তাড়াতাড়িই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষে অসঙ্কোচে সময় সময় এরা কত বড় গর্হিত কথা উচ্চারণ করে তা এরা নিজেরাই জানেনা। তাই যখন গোবিন্দ গাঙ্গুলি বেণী ঘোষালকে তোষামোদ করার জন্য বলে, এ ছোঁড়া নন্দীদের গদি থেকে অন্ততঃ তিনটি হাজার টাকা দেনা করেচে তখন পল্লীসমাজের মাথা বেণী ঘোষালকে আমরা অমন উৎফুল্ল হতে দেখি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় কুঁয়া পুরের ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; পাঁড়া গাঁ মাত্রই এইরকম। বিশঘর বামুন কায়েতের বাস নেই, গাঁয়ের মধ্যে চারটে দল। গোবিন্দ গাঙ্গুলি, পরাণ হালদারকে খোঁচা দেওয়া মানে ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া। সুতরাং কোন নির্দ্দিষ্ট পল্লীর সমাজ শরৎচন্দ্রের বর্ণনার বিষয় ছিলনা বাংলা দেশের সব পল্লীসমাজের একই চেহারা— এটা শরৎচন্দ্রের বক্তব্য ছিল। পঞ্চম পরিচ্ছেদে মধু পালের মুদির দোকানের বর্ণনা ও খরিদ্দারদের আচরণ এবং ইস্কুলের হেডমাষ্টার বনমালী পাড়ুই (যিনি রমেশকে দেখেই বলেন, আজ্ঞে আমি আপনার ভৃত্য) এবং বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় পরিচালনার বিবরণ পরিষ্কার প্রমাণ দেয় কেন তার 'গন্ডারচর্ম' স্পর্শ করা যায়নি এবং ইঙ্গিত দেয় কাদের জন্য এই অব্যবস্থা।

তেঁতুল গাছ বা মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য দলাদলির যে স্বরূপের পরিচয় রমেশ

পেয়েছে তাতে সমাজ সংস্কারের সমস্ত ইচ্ছা তার কর্পূরের মত উবে চলে গেছে। এমন অবস্থায় যখন রমেশ কুঁয়াপুর ত্যাগ করতে চেয়েছে তখন বিশ্বেশ্বরীর মুখে কি শরৎচন্দ্রের কথাই শুনিনা? 'এরা যে কত দুখী, কত দুর্বল— তা যদি জানিস্ রমেশ, এদের উপর রাগ করতে তোর আপনি লজ্জা হবে। ভগবান যদি দয়া করে তোকে পাঠিয়েচেন— তবে এদের মাঝখানেই তুই থাক বাবা! আর শুধু এরাই নয় যে গ্রামে যেখানে ইচ্ছে ঘুরে আয়, দেখবি সমস্তই এক।' অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে ম্যালেরিয়াভীতি ও জলনিকাশের অব্যবস্থাসহ এই ব্যাধি তৎকালীন পল্লী সমাজেরই স্থায়ী ব্যাধি এবং শরৎচন্দ্র সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হলেও এই ব্যাধির মূলে যে অশিক্ষাকেই দায়ী করেছেন তা বুঝতে কারো বাকি থাকে না।

উপন্যাসে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রমা রমেশের প্রেমের কাহিনী যথাযথ বিকশিত হয়নি বলেই প্রায় সর্ব সমালোচক আফশোষ করেন। আমার ধারণায় এ ক্ষেত্রেও পল্লীসমাজ চরিত্রের কাছে রমা রমেশের পরাজয় ঘটেছে। কারণ, সেই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পল্লীসমাজ বাল্যবিধবা রমার সজ্ঞান সংস্কারের সঙ্গে সচেতন প্রবৃত্তির সংঘাত ঘটাবেই এবং শেষ পর্যন্ত তাকে কোন মতে জয়ী হতে দেবে না— দেয়নিও। তাছাড়া পল্লী সমাজের মাথা বেণী ঘোষাল রমার জমিদার সত্তাকে জীইয়ে রেখে রমেশের বিরুদ্ধে মিথ্যে মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতেও বাধ্য করবে।

প্রশ্ন উঠবে— পল্লী সমাজ নিজেই যদি চরিত্র হয়ে ওঠে, তাহলে লেখক নিজেই এর নাট্যরূপ 'রমা' দিলেন কেন? সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্য পল্লীসমাজ ও রমার বিষয়বস্তু মূলতঃ এক হলেও শিল্পী শরৎচন্দ্র, নাটকের কেন্দ্রে রমার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসও 'রমা' নাটকের উপসংহার শুধু যদি কৌতূহলী পাঠক লক্ষ্য করেন তাহলেই পার্থক্যটা ধরা পড়বে। উপন্যাসে 'রাণী' সম্বোধনে যে রমা সঙ্কুচিত এবং আড়ষ্ট নাটকে সেই রমা অনেকাংশে পৃথক। প্রমাণ স্বরূপ রমা রমেশের কথোপকথন উদ্ধৃত হল—

রমা : যাত্রা করে বেরিয়ে এলাম রমেশদা, রাত আর নেই। যাবার আগে দুটি কাজ বাকি ছিল। এক তোমার শেষ পায়ের ধুলো নেওয়া, আর যতীনকে তোমার হাতে তুলে দেওয়া।

রমেশ : এ ভার আমাকেই দিয়ে যাবে রমা?

রমা : রমা ত নয়— রানী। তার সবচেয়ে আদরের ধন এই ছোট ভাইটি। তাকে তুমি ছাড়া আর কে নিতে পারে রমেশদা?

রমেশদা : কিন্তু এর কতবড় দায়িত্ব— এ অনুরোধ রমা—

রমা : এখনো রমা—?...

প্রবন্ধের বক্তব্যের সমর্থনে এই উদ্ধৃতিই কি যথেষ্ট নয়?

শরৎচন্দ্রের 'সতী'— পুনর্বীক্ষণ

'সতী' গল্পটি ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গবাণীতে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স থেকে প্রকাশিত 'অনুরাধা, সতী ও পরেশ' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভাষার জাদুকর শরৎচন্দ্রের খ্যাতি শুধু তার উপন্যাসগুলির জন্যেও নয়, বৈচিত্র্যে ভরা গল্পগুলিও তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

রবীন্দ্রনাথ সার্থক ছোট গল্পের যে নমুনা রেখে গেছেন সেই নিরিখে শরৎচন্দ্রের গল্পগুলিতে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর স্বাদ না থাকলেও বা গল্পশেষে নাটকীয় চমকের সৃষ্টি অনুপস্থিত হলেও উপন্যাসের মতই গল্পগুলিও বাঙালি পাঠকের মন কেড়েছে।

বড়ো, মেজো, ছোট যে বিশেষণেই গল্পগুলিকে চিহ্নিত করা যাক না কেন আধুনিক যুগের সূক্ষ্মতম কলাকৌশল আয়ত্ত না করেও সহজ ও সাধারণ বিন্যাসেই তিনি পাঠকমন জয় করেছেন।

১৯৯৩ সারের ৮ই এপ্রিল প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক পত্রে তিনি জানাচ্ছেন— 'গল্প শেষ করে যদি পাঠকের মনে না হয়, 'আচ্ছা বেশ!' তবে আর গল্প কি? আমি এই লাইনে চল্‌ছি।' এই 'লাইনে' চলতে গিয়ে শরৎচন্দ্র আটটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বত্রিশটি গল্প উপহার দিয়েছেন।

'সতী' গল্পটি বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, পথ নির্দেশ, মেজদিদি, একাদশী বৈরাগী, লালু, মহেশ বা অভাগীর স্বর্গের মত বহুল পরিচিত নয় কিন্তু শরৎচন্দ্রের গল্পধারায় এটি একটি ব্যতিক্রমী গল্প।

গল্পটি ৬টি পরিচ্ছেদে ধরা আছে। গল্পের নায়ক হরিশ পাবনার একজন সম্ভ্রান্ত সৎ উকিল। বয়স চল্লিশের মত। যৌবনে হরিশ ব্রাহ্ম হরকুমারের কন্যা লাবণ্যর প্রেমাসক্ত হয়। কিন্তু নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিন্দু রামমোহন তাঁর পুত্র হরিশের এই কামনাকে নরহত্যারও অধিক অপকর্ম বলে মনে করেন এবং দিনাজপুরের এক প্রাচীন উকিলের কন্যা নির্মলাকে একবার চোখে দেখেই ছেলের বিয়ের পাকা কথা দিয়ে আসেন। তাঁর যুক্তি অকাট্য— মেয়ে ডানা-কাটা পরী না হোক ভদ্রঘরের কন্যা। নির্মলার পিতার সঙ্গে শিখার গুচ্ছ, গীতার মর্মার্থ ও পেনশনান্তে কাশীবাসের উপকারিতা নিয়ে শুধু মতের মিলই নয়, এক অভিন্ন হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মায়ের সতীত্ব আর বাপের হিঁদুয়ানি নিয়ে ঘর করতে এলেই হরিশ ভাগ্যবান হবে। সুতরাং কথা নড়চড় হবার নয়। হরিশ প্রথমে বেঁকে বসলেও শেষ পর্যন্ত পিতৃবাক্যে সায় দেয় এবং লাবণ্যর অন্যত্র বিয়ে হয়।

নির্মলার সতী-সাধ্বী মা শ্বশুর ঘরে মেয়ে পাঠানোর সময় একটি মন্ত্র দেয়— 'মা, পুরুষ-

মানুষকে চোখে চোখে না রাখলেই সে গেল। সংসার করতে আর যা-ই কেননা ভোল কখনো একথাটি ভুলো না।'

বস্তুত মাতৃদত্ত এই মন্ত্রটি নির্মলা কোনদিনই ভোলেনি এবং আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছিল বলেই এই মন্ত্র-দীক্ষিতা সতী সাধ্বী নির্মলার জ্বালায় হরিশের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। হরিশের বোন উমা এই অতিষ্ঠ জীবনের নির্বাক, নীরব সাক্ষী।

সাধারণভাবে মনে হতেই পারে শরৎচন্দ্র তো আজীবন নারীর সপক্ষেই কলম ধরেছেন। নারীর সতীত্ব দেহে না মনে এই প্রশ্নে তাঁর গল্পে-উপন্যাসে পাঠককে ভাবতে বাধ্য করেছেন। সমস্ত শরৎ সাহিত্যে তো তার ভুরি ভুরি নিদর্শন মেলে। 'পল্লী সমাজে'র রমা, 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী, 'শ্রীকান্তে'র রাজলক্ষ্মী, বড়দিদির মাধবী সবাই তো তাঁর স্নেহধন্যা। তবে সতী সাধ্বী মায়ের সতী সাবিত্রী কন্যা নির্মলার দোষটা কোথায়?

দোষ খোঁজার জন্যে নির্মলার আচরণবিধি লক্ষ্য করা যাক।

গল্পে দেখা যায় হরিশের এক উকিল বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কলকাতা থেকে এক সুশ্রী, অল্পবয়স্কা কীর্তনওয়ালী আসে। সেখানে হরিশের গান শোনার নিমন্ত্রণ থাকে। গান শুনে অধিক রাতে বাড়ি ফেরায় সন্দিগ্ধচিত্ত নির্মলার উক্তি— 'রাতটা একেবারে কাটিয়ে এলেই ত পারতে।' এবং এই অপ্রত্যাশিত কুৎসিত মন্তব্যে তাঁদের প্রায় দশদিন বাক্যালাপ বন্ধ থাকে।

একবার হরিশ দুরারোগ্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। হরিশের পিতৃদেব তখন মৃত এবং মাতা সন্তানের ব্যাধিতে দিশেহারা। নির্মলা জানায়— 'আমি যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই, আমার নোয়া-সিঁদুর ঘুচোবে সাধ্য কার?' তার এই বিশ্বাস নিয়েই নির্মলা শীতলার থানে হত্যা দেয় এবং দৈবক্রমে হরিশ সে যাত্রা প্রাণ ফিরে পায়। এই ঘটনায় পাড়া পড়শীর কাছে খনা, লীলাবতী, গার্গীর পাশে নির্মলার ঠাঁই হয়ে যায় এবং হরিশ যে স্ত্রীভাগ্যে গর্বিত সে কথা সবাই সোচ্চারে বলতে থাকে। পাড়া পড়শীর কাছে নির্মলা দেবীত্বের আসনে প্রতিষ্ঠা পেলেও হরিশ কিন্তু জানে তাঁকে চোখে চোখে রাখা এবং অকারণে সন্দেহ পোষণ করা নির্মলার পতিপ্রেম তার কাছে 'সুদুঃসহ নাগপাশের বাঁধন।'

হরিশের মক্কেল গোঁসাইচরণের বিধবা পুত্রবধূ অন্যান্য পুত্রদের সঙ্গে বিষয়-সংক্রান্ত মামলায় পরামর্শ নিতে এসেছে তাঁর বসার ঘরে। সে দৃশ্যও নির্মলার কাছে অসহনীয়। সমস্ত মানসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে পর্দা ঠেলে সামনে এসে নির্মলা বলে— ফুসফুস করে কথা কয়ে আমাকে ফাঁকি দেবে?' ঘটনার আকস্মিকতায় লজ্জায়, ঘৃণায় হরিশের বাক্‌রুদ্ধ হয়।

সন্দিগ্ধচিত্ত নির্মলার সম্পর্কে হরিশের ধারণা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ তাঁর প্রথম জীবনের প্রণয়পাত্রী লাবণ্যর মেয়ে-ইস্কুলের পরিদর্শক হয়ে পাবনায় আসা। নির্মলা চায় না তাঁর স্বামী লাবণ্যর সংস্পর্শে আসুক। অথচ লাবণ্য এখন বিধবা এবং দশ বৎসর বয়স্ক সন্তানের জননী।

হরিশ লাবণ্যর মনস্তত্ত্ব জানে বলেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও লাবণ্যর সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় ও সংস্পর্শের কথা গোপন করে। নির্মলার ঈর্ষা ও পাগলামির স্বরূপ জানে বলেই হরিশ ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যাচারণা করে কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় তাঁর মিথ্যাবাদিতা ধরা পড়ে। অগ্নিতে

ঘৃতাহুতির মত কাজ করে হরিশকে লেখা লাবণ্যর চিঠি— 'আজ আমার ছেলের জন্মতিথি, কোর্টের ফেরত একবার এসে তাকে আশীর্বাদ করে যাবেন এই ভিক্ষা। — লাবণ্য।' এবং এর পরেও আছে পুনশ্চ অংশে নৈশভোজে আপ্যায়নের সংবাদ এবং তৎসহ গীত-বাদ্যের আয়োজন।

এই ঘটনার পরিণতিই নির্মলার আফিঙ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা এবং পাড়াপড়শিদের কুৎসিত সমালোচনা। যেন সমস্ত ঘটনাটার জন্যই 'স্কাউন্ড্রেল' হরিশই দায়ী এবং সতী-সাধ্বী নির্মলা একেবারেই নির্দোষ।

শরৎচন্দ্র ঘটনার সত্যতার পরিচয় দিয়েছেন গল্পে প্রায় উপেক্ষিতা হরিশের ছোটবোন উমার সংলাপে— 'দাদা, তুমি আবার বিয়ে কর।' হরিশ পাল্টা যুক্তি দিয়ে বোনকে বোঝাতে চাইল তা সম্ভব নয় কারণ 'তোর বৌদির যদি এ-পথ খোলা থাকত তোর কথায় রাজি হতাম উমা।' দাদার হৃদয় যন্ত্রণার নীরব সাক্ষী উমা বলতে বাধ্য হয়েছে— 'পথ নাই! পথ নাই! এই আনন্দহীন জীবনে দুঃখই ধ্রুব হইয়া রহিল।'

উমার মুখের এই উক্তি আসলে শরৎচন্দ্রেরও। তাই গল্পের শেষে লেখকের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য উল্লেখ করার মত।

গল্পের শেষাংশে একদল বৈষ্ণব ভিখারীর গানের মূলকথা— কৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে ছেড়ে যমুনায় গেছেন। উদ্দেশ্য কংস বধ। কিন্তু বিরহাতুরা রাধার হৃদয় বাধা মানছেনা। দূতীর বিলাপে তাইই প্রতিধ্বনিত।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের ব্যাখ্যা— 'কংস টংস সব মিছে কথা। আসল কথা শ্রীরাধার একনিষ্ঠ প্রেম। ...... তবু তখনকার কালে তো ঢের সুবিধা ছিল, মথুরায় লুকিয়ে থাকা চলত। কিন্তু এ-কাল ঢের কঠিন! না আছে পালাবার জায়গা, না আছে মুখ দেখাবার স্থান। এখন ভুক্তভোগী ব্রজনাথ দয়া করে অধীনকে একটু শীঘ্র পায়ে স্থান দিলেই বাঁচি।'

শরৎচন্দ্রের ব্যাখ্যায় হরিশের মনস্তত্বই প্রকাশিত। যে একনিষ্ঠ প্রেম স্বামীকে একেবারে বাকসবন্দী করে সম্পূর্ণরূপে নিজের করে পেতে চায়, চোখের আড়াল হলে স্বামীর সম্পর্কে অকারণ সন্দেহ পোষণ করে, পরস্ত্রীর সান্নিধ্যে এলেই স্বামীকে তাঁর প্রতি লালসাপ্রবণ বলে ধারণা করে সেই একনিষ্ঠ প্রেমের মূল্য কোথায়?

শরৎচন্দ্র বলতেন— 'একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় তো এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়? এই বক্তব্যের উদাহরণ দিতেই যেন সতী গল্পটি লেখা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন ''সতী'-তে হিন্দুসমাজে অতি-প্রচলিত সতী-প্রশস্তির বিপরীত দিকটা দেখান হইয়াছে।'' 'শরৎচন্দ্রের গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সতী নির্মলার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনী এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দেবী' গল্পের নায়িকার তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন সোহিনী হয়তো 'সমাজ নির্দিষ্ট অর্থে 'সতী' নয়, কিন্তু তার মৃত স্বামীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি তার দায়বদ্ধতার তুলনা নেই।' প্রভাতকুমারের দেবী মানবীই থাকতে চেয়েছিল মনেপ্রাণে। কিন্তু

শ্বশুর কালীকিংকরের যূপকাষ্ঠে আত্মদান করতে বাধ্য হয়েছিল। পরন্তু 'সতী' নির্মলা মানুষের স্বাভাবিকতাকেই স্বীকার করেনি বা করতে শেখেনি। এই প্রসঙ্গে হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য— 'শরৎচন্দ্র এই গল্পে বোঝাতে চেয়েছেন প্রাপ্তমনস্ক নারীপুরুষ একনিষ্ঠার পাশাপাশি বোধ হয় সমমনস্কতাও কামনা করে। সাইকোলজির এই স্বাভাবিক গতিকে এথিক্স দিয়ে বোধ হয় বাঁধা যায় না।'

শরৎসাহিত্যের পুরুষপ্রধান সমাজে পুরুষরাই সচরাচর নারীদের বন্দিনী করে রেখেছে। দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করে একান্তভাবেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ভোগের সামগ্রী করে রেখেছে কিন্তু নির্মলা তো এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী চরিত্র। আর এখানেই 'সতী' গল্প শরৎচন্দ্রের গল্পধারায় এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

শিশুসাহিত্যে নজরুল

জন্মশতবর্ষে এসেও নজরুলকে কেউ 'চড়া গলার কবি', 'হুজুগে কবি', কেউ 'সাম্যবাদী কবি', কেউ 'প্রেমিককবি' এবং সকলের চেয়ে বেশি 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু নজরুলকে তো আরও নানাভাবে চিহ্নিত করা যায়। সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু সংগীতকার রূপেও নজরুল বেঁচে থাকবেন। 'বিদ্রোহী' বিশেষণটি নজরুলের নামের আগে এমনভাবে সেঁটে দেওয়া হয়েছে যে নজরুলের বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতার আলোচনাতেও এই বিশেষণটি ব্যবহার করতে দেখি। নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক নজরুলের আলোচনা তুলনামূলকভাবে কম। যেমন নজরুলের শিশুসাহিত্য নিয়ে আলোচনাও অনেকখানি উপেক্ষিত। বর্তমান নিবন্ধে সেই বিষয়েই আলোকপাত করা হবে।

প্রশ্ন হল শিশুসাহিত্য কাকে বলব?

যে ধরনের সাহিত্যের মধ্যে শিশুমনের আশাআকাঙ্ক্ষা, আনন্দবেদনা ইত্যাদি শিশুমুখের ভাষায় সার্থক রূপায়ণ হয় তাইই যথার্থ শিশুসাহিত্য। উদাহরণস্বরূপ নজরুলের 'নবার নামতা পাঠ' কবিতাটি উদ্ধৃত হল :

একেক্কে এক—
    বাবা কোথায়, দেখ্।
দুয়েক্কে দুই—
    নেইক? একটু শুই।
তিনেক্কে তিন—
    উহুহু। গেছি! আলপিন
চারেক্কে চার—
    ঐ ঘরে আচার
পাচেক্কে পাঁচ—
    হুই দেখ্ কুলের গাছ।
ছয়েক্কে ছয়—
    বাবা গুডবয়।
সাতেক্কে সাত—
    পন্ডিতমশাই কাত।
আটেক্কে আট—
    আমি বড় লাট।
দশেককে দশ—
    বাবা আপিস! [illegible]

কবিতাটিকে সার্থক শিশুসাহিত্যের নিদর্শন বলা চলে কেন? প্রথমত, কবিতার ভাষা ও শব্দচয়ন নজরুলের নয়, যেন এক শিশুর সৃষ্টি। দুরূহ বা দুরুচ্চার্য একটিও শব্দ নজরুল সচেতনভাবে রাখেননি। দ্বিতীয়ত, কবিতার অন্ত্যমিলগুলি সহেজেই শিশুর কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছয়। তৃতীয়ত, কবিতাটিতে শিশুমনের নিরাবরণ ও নিরাভরণ যে প্রকাশ আছে তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। বাঙালী সমাজে শিশুদের কাছে মায়ের চেয়ে বাবাই বেশি ভয়ের বস্তু। তাই যে শিশু শুরুতেই "বাবা কোথায় দেখ" বলে শুরু করেছিল সে যখন বাবাকে অফিসে রওনা হতে দেখে, তখন "বাবা আপিস! ব্যাস।" বলে তাকে স্বতস্ফূর্ত আনন্দে প্রায় নৃত্যরত অবস্থায় দেখা যায়। তাছাড়া এই কবিতার মধ্যে শিশুর আলসেমি থেকে আচারের লোভ পর্যন্ত খুব সহজেই ধরা পড়েছে। এ শিশু বিশ্ববিখ্যাত মরিস মেটারলিঙ্কের প্রতীকী শিশু নয়। এমনকি রবীন্দ্রনাথের শিশু সম্পর্কিত অনেক কবিতায় যে দার্শনিক তত্ত্ব থাকে তাও এখানে অনুপস্থিত। ডাকঘর নাটকের অমলও নয় এই শিশু। এই শিশুকে হাজির করাতে নজরুলকে কোনো কষ্টকল্পনা করতে হয়নি বা পূর্বসূরীদের কাব্যভান্ডারের দ্বারস্থও হতে হয়নি। এমন নিদর্শন নজরুলের বহু কবিতায় ধরা পড়ে।

'খুকী ও কাঠবেরালি' কবিতা পড়লে আমাদেরই ঘরের অতি চেনা এক শিশু কন্যাকে দেখি যে গাছে উঠতে পারে না অথচ পেয়ারা খাবার খুব ইচ্ছে। আমরা অনুমান করতে পারি সে তার স্বভাবসুলভ আধো আধো ভাষায় কাঠবেরালির সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য গুড়মুড়ি, দুধভাত, বাতাবিলেবু, লাউ সবকিছুই দিয়ে দিতে রাজি। এগুলো কাঠবেরালির খাদ্য না অখাদ্য সে বিবেচনা-বোধও তার নেই। তার কথায় কর্ণপাত না করে কাঠবেরালি যখন পেয়ারা ভোজনে ব্যস্ত তখন সে তার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক পাতাতে চায় :

> কাঠবেরালি! তুমি আমার ছোড়দি হবে? বৌদি হবে? হুঁ!
> রাঙাদিদি? তবে একটা পেয়ারা দাওনা! উঃ!

কিন্তু তাতেও যখন কিছু হয়না তখন তার দুটি ভরসা। এক, ভগবানের কাছে নালিশ:

> হেই ভগবান। একটা পোকা যাস্ পেটে ওর ঢুকে।

দুই : মাকে সাক্ষী রেখে তাকে শাপ-শাপান্ত করা:

> দাঁত দেখিয়ে দিচ্ছ যে ছুট? অ'মা দেখে যাও!
> কাঠবেরালি! তুমি মর! তুমি কচু খাও!!

এ শিশু পৃথিবীর কোনও নির্দিষ্ট দেশের বা কালের শিশু নয়— এ শিশু সকল দেশের চিরকালের এক চিরন্তন শিশুমূর্তি।

নজরুলের কবিতায়, গল্পে বা নাটকে অঙ্কিত শিশুদেরও মোটামুটি দুশ্রেণীতে ভাগ করা যায়। শিশু এবং কিশোর-কিশোরী। অবশ্য এই সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। যেমন 'পুতুলের বিয়ে' নাটকে কমলি যখন টুলিকে বলে 'আজ যে আমার চীনে পুতুলের সঙ্গে তোর মেম পুতুলের বিয়ে" তখন বক্তার শৈশব ও কৈশোরের সীমারেখা নির্ধারণ করাটা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। অথবা 'খাঁদুদাদু' কবিতায় যে বলে :

> অ'মা। তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
> খ্যাঁদা নাকে নাচ্‌ছে ন্যাদা— নাক্-ডেঙাডেং-ড্যাং।

সে আর কাঠবেরালির খুকী যে সমবয়স্ক নয় তা কাউকে বলে বুঝিয়ে দিতে হয়না। কিংবা প্রকাশক আলি আকবর খানের অনুরোধে পাঠ্যপুস্তকের জন্য লেখা বিখ্যাত সেই 'লিচুচোর' কবিতার কিশোরটি। বয়স তার যাই হোক না কেন নিজের অপরাধের কথা অকপটে সকলকে বলতে যার বিন্দু মাত্র লজ্জা নেই:

বাবুদের তাল পুকুরে
হাবুদের ডাল-কুকুরে
সে কি বাস্ করলে তাড়া,
বলি থাম একটু দাঁড়া
পুকুরের ঐ কাছে না
লিচুর এক গাছ আছে না

কবিতাটি পড়তে পড়তে মনে হয় বাংলাদেশেরই এক দামাল, দুরন্ত শিশু তার সমবয়সীদের কাছে গল্পচ্ছলে বলছে তার লিচুচুরির ইতিবৃত্ত। লিচুচুরি করতে গিয়ে তার যে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল তার জন্য তার প্রতিজ্ঞা:

যাব ফের? কান মলি ভাই,
চুরিতে আর যদি যাই।

কিন্তু যতই সে 'নাক খপ্‌তা' খাক না কেন অনুমান করতে পারি আবার সে তার প্রতিজ্ঞা ভুলবে। হয়তো লিচুর বদলে আম, জাম বা জামরুল চুরি করবে। নজরুলের সাহিত্যে এই শিশুরাই যখন বড়ো হবে তখন তারা সমগ্র জাতির বা জনজীবনের পথপ্রদর্শক।

কবিতা অথবা গানের মতো বিংশ শতাব্দীর শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রেও নজরুলের অবদান কোনও অংশে কম নয়। বাংলাসাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি সচেতনভাবে যে ধারার সৃষ্টি করেছিলেন এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায় প্রমুখ যা সযত্নে লালন করেছেন সেই ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন শিশু সাহিত্যিক কাজী নজরুল ইসলাম।

সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে নজরুল আজও দিশারি

স্বাধীনতার ৫০ বছর পার হতে চলল। স্বাধীনতার পূর্ব ক্ষণে বা জন্ম লগ্নে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা তখন ভারতবাসীকে বিব্রত করেছে আজও সেই সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারিনি। ১৯২৬ বা ১৯৪৬ এর দাঙ্গার ভয়াবহতা আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখেছি। ভুলেছিও। কিন্তু এই দশকেই ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িকতার বিষময় পরিণাম আমরা চাক্ষুষ করলামও তো। সুতরাং সমস্যাটা এখনো আছেই এবং নজরুলের ভাষায়, 'মানুষের পশুবৃত্তির সুবিধা লইয়া ধর্মান্ধদের নাচাইয়া কত কাপুরুষ না আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল।' এখনো মিথ্যে হয়েছে কি? আর হয়নি বলেই মানবপ্রেমিক নজরুলের চিন্তা আমাদের পাথেয় করতেই হবে। আমরা স্মরণ করি বড় যন্ত্রণাময় সেই উচ্চারণ—

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্-লা'রা ক'ন হাত নেড়ে,
'দেব-দেবী নাম মুখে আনে সবে দাও পাজিটার জাত মেরে।
ফতোয়া দিলাম-কাফের কাজীও,
যদিও শহীদ হইতে রাজীও!
'আম-পারা' পড়া হামবড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে।
হিন্দুরা ভাবে পার্শী শব্দে কবিতা লেখে, ও জাত নেড়ে।'

যখন সারা দেশে ইংরেজ শাসনের অবিচার অত্যাচারে শাসন-শোষণের আঘাতে মানুষ জর্জরিত তখন যে কবি সহিংস, প্রবল উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে খড়গহস্ত তখন তাঁরই দেশের হিন্দু-মুসলমান ভাইরা তীব্র সমালোচনায় তাঁকে করেছে ক্ষতবিক্ষত। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, 'কন্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে।' সুতরাং এই সমস্ত সমালোচনার কাঁটা রবীন্দ্রনাথের মত নজরুলকেও যন্ত্রণাকাতর করেনি তা নয় কিন্তু তবুও বিদ্রোহী চেতনাবাহী নজরুল অচল অটল ভাবে লিখেছেন— 'হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ওই দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, এটা হয় পন্ডিত্ব। তেমনি দাড়িত্বও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি। আজ যে মারামারিটা বেধেছে সেটাও এই পন্ডিত-মোল্লায় মারামারি হিন্দু মুসলমানের নয়। নজরুলের চিন্তা যে নির্ভুল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান ভারতের মৌলবাদী আক্রমণ ও তাই প্রমাণ করে। আর সাধারণ মানুষও এই পন্ডিত মোল্লাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, পরিচালিত হয়, তাঁদের বাক্যকে বেদ-কোরাণের মত অভ্রান্ত মনে করে।

প্রশ্নটা হল এই অবনমন থেকে উদ্ধারের পথটা কী? পথ হল নজরুলের উদার মানবতাবাদী চিন্তাকে উপলব্ধি করা, অনুসরণ করা এবং সমাজের সর্বস্তরে সেটাকে কার্যকরী করা।

হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিস্টান, কোন মানুষ জলে ডুবে যায় তখন যে মানসিকতা বলে আগে মানুষটিকে উদ্ধার করো জাত খুঁজবে পরে-ধর্ম দেখবে পরে-সেই মানসিকতার অধিকারী হতে হবে জাতিধর্ম নির্বিশেষ সবাইকে।

"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কান্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র।

এই উচ্চারণে কোনো খাদ ছিলনা, কপটতা ছিল না কাজী নজরুল ইসলামের। কিন্তু আমরা বাঙালীরা তথা ভারতীয়রা ওই বাণীর মর্যাদা আজও দিতে পারিনি।

কিন্তু মর্যাদা আমাদের দিতেই হবে। আমাদের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে, ভারতবর্ষের স্বার্থে। অনুভব করতেই হবে—

'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।।'
হুকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান,
তাই'ত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশ'-খান!

চোখকান খোলা রেখেই আমাদের দেশনেতাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে হবে, বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে এবং অনুসরণ যোগ্য হলে অনুসরণও করতে হবে। নচেৎ নজরুল শুধু পুঁথিতেই আবদ্ধ থাকবেন যা মুজফ্‌ফর আহমেদের স্নেহধন্য, গুণমুগ্ধ এই আদর্শ কবি কোনদিন চাননি।

প্রেম-কবিতায় নজরুল

যে কবিতার জন্য নজরুলের সর্বাধিক পরিচিতি সেই 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল লিখেছেন—

মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য।

এই 'রণ-তূর্য' ধ্বনি আমাদের এমনভাবে আকর্ষণ করে, যে 'বাঁশের বাঁশরীর' সুর সহজে আমাদের মরমে পশেনা। অথচ নজরুল কাব্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক এই 'বাঁশের বাঁশরী'। সহজ কথায় 'বাঁশের বাঁশরী' নজরুলের প্রেম চেতনার প্রতীক।

অনেকে বলবেন বিদ্রোহীর আবার প্রেম কীসের? বিদ্রোহীর প্রেম কি বাঞ্ছিত? রবীন্দ্রনাথ তো চার অধ্যায় উপন্যাসের এলা-অতীনের প্রেমকে কটাক্ষ করেছেন। কিন্তু মানবিক প্রেমকে কেন্দ্র করে মুক্তিসংগ্রামীর কর্ম, চিন্তা, চেতনা তো আবর্তিত হতেই পারে। প্রমাণ— তুরস্কের বিদ্রোহী কবি নাজিম হিকমতের Letters from Prison কবিতা।

হিকমত বলেছেন—

"I am among men,
I love mankind
I love action
I love thought
I love my struggle"

তেমনি কবি তার প্রিয়তমাকে একই সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারেন 'inside my struggle' I love you. এমন কথা নজরুলের মুখেও শোভা পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় নজরুল প্রতিভা বিশ্লেষণে অনেক সময় এই দিকটি উপেক্ষিত হয় বা সমধিক মনোযোগ পায়না।

বিদ্রোহী নজরুলের এই প্রেমচেতনার বিকাশে কয়েকজন নারীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এমন সমস্ত নারী যাঁরা নজরুলের বাঁশের বাঁশরীতে আকৃষ্ট হয়েছেন বা বাঁশরী যাঁদের আকর্ষণ করেছে। এক, চুরুলিয়ার পাশের গ্রামের বা রাণীগঞ্জের কোন কিশোরী। হাবিলদার নজরুলের জীবনে এই কিশোরী এক সময় হারিয়ে যায়। তার চুলের কাঁটা ছিল নজরুলের কাছে এক স্মৃতিচিহ্ন। নজরুলের 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে তাকে স্মরণ করে লেখা—

মানসী আমার!
মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে
ক্ষমা করনি,
তাই বুকের কাঁটা দিয়ে
প্রায়শ্চিত্ত ক'রলুম।

দুই, দৌলতপুরের পাঠ্যপুস্তক ব্যবসায়ী আলি আকবর খানের বুবুর (দিদি) মেয়ে সুন্দরী সৈয়দা

খাতুন। সৈয়দার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পরিণতি প্রেম। প্রেমিক নজরুল তাঁর নামকরণ করলেন নার্গিস। বিয়ের পরে দৌলতপুরে বাস করার প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে নজরুল বিয়ের আসর ছেড়ে চলে এসেলছিলেন।

তিন, কুমিল্লার, গিরিবালা দেবীর একমাত্র কন্যা আশালতা বা প্রমীলা সেনগুপ্ত, ওরফে দোলন বা দুলি। দুলি তখন ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। এঁকেই কবি শেষে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছেছিলেন এবং গৃহিনী সচিবসখা হিসেবে যিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পাশে ছিলেন।

চার, টাঙ্গাইলের ওয়াহেদ আলী খাঁর কন্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্রী ফজিলতুন্নেসা, যিনি অঙ্কশাস্ত্রের মিশ্র বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানাধিকারী হয়েছিলেন। নজরুল কাজী মোতাহার হোসেন মারফত ফজিলতুন্নেসার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অল্প সময়েই প্রেম নিবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

পাঁচ, চট্টগ্রামের শামসুন্নাহার, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের বাহার-নাহারদের বাড়িতে থাকার সময় যাঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল।

নজরুল জীবনে এই সমস্ত নারীর প্রভাব নিয়ে ওপার বাংলায় যথেষ্ট গবেষণাও হয়েছে। কল্পতরু সেনগুপ্ত বলছেন— 'ঢাকায় এই গবেষকদের লেখা পড়ে মনে হয় তাঁরা যেন নজরুলকে গোপিনীবল্লভ কলির কৃষ্ণ সাজাতে চান।'

বস্তুত কলির কৃষ্ণ সাজাবার দুরভিসন্ধি যাঁদের আছে তাঁদের ধিক্কার জানাই। কিন্তু তন্নিষ্ঠ গবেষকরা কবির কাব্য আলোচনায় নানা ধরনের প্রভাব লক্ষ্য করতেই পারেন। সেক্ষেত্রে বিশেষত প্রেম কবিতায় নারী সান্নিধ্য উদ্দীপনাময়ী ভূমিকা নিতেই পারে। এদের কাউকে কবির ভালো লেগেছিল, কাউকে কবি ভালোবেসেছিলেন। ভালো লাগা আর ভালোবাসা সমার্থক নয়। তেমনি কখনও মোহের অপর নাম ছিল ভালোবাসা। এদের কেউ তাঁকে কারণে-অকারণে আঘাত দিয়েছেন, শোকাতুর করেছেন, উন্মাদনা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু উন্মত্ত করেননি। তাহলে এধরনের উন্নতমানের প্রেম কবিতা আমরা পেতাম না। কারণ কেবল শোকোন্মত্ত কাব্য সৃষ্টিতে অপারগ। আমাদের বক্তব্য কবির অত্যন্ত স্পর্শকাতর রোমান্টিক মনে বিভিন্ন প্রভাব জারিত হয়ে কিছু প্রেম কবিতা সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলি একান্তভাবে কাজী নজরুলের বিশিষ্টতা বহন করে।

নজরুলের প্রেম কবিতাগুলি দাঁড়িয়ে আছে দোলনচাঁপা, ছায়ানট, পূবের হাওয়া, সিন্ধু হিন্দোল, চক্রবাক ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে।

এই সমস্ত কবিতায় কখনও দোলন কখনও নার্গিস কখনও ফজিলত সরাসরি সামনে এসেছে আবার কখনও এদের সম্মিলিত মূর্তি তার কবিতায় কায়া গঠনে সাহায্য করেছিল। অর্থাৎ বিশেষ তখন নির্বিশেষ হয়ে গেছে।

নজরুলের প্রেম কতিায় দেহ উপেক্ষিত হয়নি। আবার মোহিতলালের মত ভোগবাদ আসেনি। এই শ্রেণীর কবিতায় ঈর্ষা আছে। ঈর্ষাজাত অভিমান আছে। কখনও আছে অভিযোগ বা অনুযোগ। বিরহীর অনুতাপের পাশাপাশি প্রবল সৌন্দর্য তৃষ্ণা আছে। আবার কখনও কখনও নারী ও প্রকৃতি একাকার হয়ে গেছে। নজরুলের প্রেমগীতিও প্রেমকবিতা অনেক সময় একই ভাবনার পরিপূরক।

এই কথাগুলি মনে রেখে এবারে কয়েকটি কবিতার সৌন্দর্য আস্বাদন করা যেতে পারে।

প্রেমিকের চোখে প্রিয়তমা সব সময়ই তুলনাহীন। প্রিয়ার কণ্ঠস্বর, কেশদাম, চোখের চাহনি এবং ওষ্ঠাধর সব দেশের কবির আকর্ষণ স্থল। এক্ষেত্রে কালিদাস যেমন সযত্নে যক্ষপ্রিয়াকে সাজান, তেমনই ইংরেজ কবি John Masefield যখন বলেন— 'And his voice and her hair and eyes and the dear red curve of her lips'. তখন বুঝি সব সৌন্দর্য প্রেমিক কবির কাছে তাঁদের প্রিয় অদ্বিতীয়া। ভাষা আলাদা, প্রকাশভঙ্গী প্রায় সমান্তরাল।

সঙ্গীতে নজরুল তাঁকে সাজান মনের মাধুরী দিয়ে—

মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী
দিব খোঁপায় তারার ফুল।
কর্ণে দুলাবো তৃতীয়া তিথির
চৈতী চাঁদের দুল।

আর কবিতায়—

অধর ফুল
রাতুল্ তুল
রাতুল্ তুল
দোদুল দুল
দোদুল দুল।

কবি দৃষ্টিতে কখনো প্রেমিকা 'পূজারিণী'র পবিত্র মূর্তির নামান্তর। দোলনচাঁপা গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রেম কবিতা পূজারিণীতে কবি প্রেমিকাকে 'ভিখারিনী', 'জন্ম ভিখারিনী', 'অপরিচিতা', 'চির পরিচিতা', 'অনাদৃতা সীতা', 'তাপস-বালিকা', 'অনন্ত কুমারী সতী', 'শাপভ্রষ্টা দেববালা' প্রভৃতি বিচিত্র বিশেষণে বিশেষিত করেছেন যা প্রমাণ দেয় রোমান্টিক প্রেমের অতৃপ্তি ও যন্ত্রণার জ্বালার। তবুও শেষ পর্যন্ত কবির ভাষায়—

জানিলাম, আমি তোমা'
জন্মে জন্মে চিনি।
পূজারিণী!

এ যেন জীবনানন্দের সেই হাজার বছর ধরে বনলতা সেনকে খোঁজার অন্য ভাষা মাত্র। আবার উপেক্ষিত হতাশ প্রেমিকের, দীর্ঘশ্বাস ধরা পড়েছে 'অভিশাপ' কবিতায়।

যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে।
অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!
ছবি আমার বুকে বেঁধে
পাগল হয়ে কেঁদে কেঁদে
ফিরবে মরু কানন গিরি,
সাগর আকাশ বাতাস চিরি'
যেদিন আমায় খুঁজ্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে।

এই কবিতায় প্রেমিক স্পষ্টতই অভিমানী। 'আশান্বিতা' কবিতায় আছে প্রেমিকের কল্পিত সান্ত্বনা বাক্য।

প্রেমিকা সেখানে বলে—

জানি সখা, আমার চোখের একটি বিন্দু অশ্রুজল,
নিব্‌বে তাতেই তোমার বুকের অগ্নি-সিন্ধু নীল গরল
আমার চোখের অশ্রুজল।

এই কবিতায় আছে প্রেমের একটি চিরন্তন আশ্বাসের সুর। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—

কাঁদলে আমি আসবে ছুটে, রইতে দূরে নার্‌বে নাথ!
সেই আশাতে জাগবে রাত।

তাই আশ্বান্বিতা প্রেমিকা কবির 'আদর-সোহাগিনী' এবং 'তোমার রাণী' বলে গরবিনী হতে চায়।

'কবিরাণী' কবিতায় কবিরাণী কবির প্রেমের অমৃতরূপিনী মানসী। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কবি এই মানসীর চোখে আত্মস্বরূপ খুঁজে পান।

'তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি
আমার এরূপ— সে যে তোমার ভালবাসার ছবি।'

ছায়ানট কাব্যে কবি 'এসো এসো আমার চির পুরানো' হৃদয় জুড়ানো 'চিরন্তনী প্রিয়া'কে খুঁজে পেতে চান। কখনো দেখি তার 'মানস বধুকে' বর্ণনা করে লেখা—

যেমন ছাঁচি পানের কচিপাতা প্রজাপতির ডানার ছোঁয়ায়,
ঠোঁট দুটি তার কাঁপন-আকুল একটি চুমায় অমনি নোয়ায়।।

'নাম্ হারা সেই আমার প্রিয়া'কে বর্ণনায় কবির স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও বেদনা করুণ রসে সিক্ত হয়ে অপূর্ব সুধা সঞ্চার করেছে।

'পূবের হাওয়া' কাব্যগ্রন্থে 'প্রণয় নিবেদন' কবিতায় যে ছবি ফুটে উঠেছে তা এক কিশোরী কন্যার।

'বুকের আঁচল মুখের আঁচল বসন শাসন টুটে ঐ
শঙ্কা আকুল কি যে আশা ভালোবাসা ফুটে সই?

'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যে স্থায়ীভাব প্রেম। এই কাব্যে 'সিন্ধু' প্রথম তরঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গ ও তৃতীয় তরঙ্গ, 'গোপন প্রিয়া', 'অনামিকা' প্রভৃতি কবিতাগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই সব কবিতায় অনেক ক্ষেত্রে প্রেম ও প্রকৃতি একাকার হয়ে গেছে। সিন্ধু এখানে নজরুলের বিরহী অভিমানী অতৃপ্ত ও ক্ষুধার্ত প্রেমিকের প্রতিমূর্তি। এই একাত্মতাবোধে সিন্ধুর সঙ্গে কবি বন্ধুরূপে কথা বলতে পারেন।

কত কথা আছে— কত গান আছে শোনাবার।
কত ব্যথা জানাবার আছে— সিন্ধু, বন্ধু গো আমার!
'আমিও বিরহী, বন্ধু তুমিও বিরহী।'

'অনামিকা' কবিতায় কবির প্রেয়সী তৃষ্ণা জাগানিয়া। অনেকটা উর্বশীর সঙ্গে কবি সাদৃশ্য খুঁজে পান, কবির ভাষায়—

অরূপা লো! রতি হয়ে এলে মনে,
সতী হ'য়ে এলে নাক' ঘরে!

কবির এই অনন্ত যৌবনা মানস রঙ্গিনী বাসনা সঙ্গিনীকে অনেক সমালোচক রবীন্দ্রনাথের মানস সুন্দরীর সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে ফেরেন। রবীন্দ্রনাথের মানস প্রিয়ার ব্যঞ্জনা না থাকলেও এটা সত্য যে কবি ক্ষণিক প্রেমের সন্ধানে চিরন্তন প্রেমের সাক্ষাৎ পান।

'গোপন প্রিয়া' কবিতার প্রিয়া অনামিকা হলেও রহস্যময়ী নয়।

কিন্তু সে কবির প্রেরণার উৎস বলে অন্য কিছু প্রত্যাশা না করেই কবি তাকে গান শোনাবেন।

গাইব আমি, দূরে থেকে শুনবে তুমি গান।
থামলে আমি— গান গাওয়াবে তোমার অভিমান।
শিল্পী আমি, আমি কবি,
তুমি আমার আঁকা ছবিব।
আমার লেখা কাব্য তুমি, আমার রচা গান।
চাইব নাক' পরাণ ভ'রে ক'রে যাব দান।

'চক্রবাক' কাব্যেরও মূল সুর প্রেম বিরহ। তার হৃদয় চক্রবাক প্রিয়া চক্রবাকীর জন্যে হাহাকার রত কবি এখানে শায়ক বেঁধা প্রেমিক। এই কাব্যের উৎসর্গ পত্রে কবি বলেন—

শায়ক বিঁধিয়া বুকে উড়িয়া বেড়াই
চর হ'তে আন-চরে সেই গান গাই।

চক্রবাকের প্রথম দুটি লাইন

ওগো ও চক্রবাকী!
তোমারে খুঁজিয়া অন্ধ হ'ল যে চক্রবাকের আঁখি।

এই কবিতার রোমান্টিক বিষন্নতা এই কাব্যের বহু কবিতায় দেখা যায়। এই বিষন্নতা সৃষ্টিতে প্রকৃতির অবদানও কম নয়। এই কাব্যে 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' যেমন ফজিলতুন্নেসাকে মনে করায় তেমন এই কাব্যের একটি কবিতার নাম কর্ণফুলি। চট্টগ্রামের এই নদী কর্ণফুলিকে কবি তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে এক করে ফেলেছেন।

তুমি কি পদ্মা, হারানো গোমতী, ভুলে যাওয়া ভাগীরথী—
তুমি কি আমার বুকের তলায় প্রেয়সী অশ্রুমতী?

অপর পক্ষে 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতা চট্টগ্রামের শামসুন্নাহারকে মনে করিয়ে দেয়। শামসুন্নাহারকে একটি চিঠিতে নজরুল লিখে ছিলেন—

'আমার বন্ধু সিন্ধু, কর্ণফুলির খবর তো তুমি দিতে পারবে না তবে গুবাক তরুর সারির নিশ্চয় দিতে পারবে।''

কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সাহিত্য গ্রন্থের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতায় এক কিশোরীর প্রথম ভালবাসা এবং নীরব

প্রেমের বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রকৃতির রূপকে প্রকাশিত।''..... কবি তো তাকে নিয়ে ঘর সাজাতে চাননি, কেবল অমরাবতী সৃজন করেছেন। কবির আশ্বাস—

তোমাদের পাণে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না।
কোলাহল করি' সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিবনা।
—নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ!

এই গন্ধবিধুর ধূপের মতোই কবি নিজেকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে সমগ্র বাঙালি হৃদয়কে সৌরভময় করেছেন— নজরুলের প্রেম কবিতা বিশ্লেষণে এই সত্য আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

মহাত্মাজীর উদ্দেশে—সুকান্ত

আগের উচ্চ মাধ্যমিক সংকলনের অন্তর্ভুক্ত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের 'মহাত্মাজীর উদ্দেশে' কবিতাটি ('ঘুম নেই' কাব্যগ্রন্থে যার নাম 'মহাত্মাজীর প্রতি') নিয়ে মাঝে মাঝেই সুকান্ত-অনুরাগীদের কাছ থেকে বিরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়। এতো কবিতা থাকতে হঠাৎ এই কবিতাটি সংকলিত হলো কেন? এটা তো সুকান্তর প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা নয়। এখানে সুকান্তর মানসিক প্রতিফলন পড়েনি ইত্যাদি ইত্যাদি।

গান্ধীজি ও সুকান্তর অবস্থান দুই মেরুতে হওয়া সত্ত্বেও অনেকের কাছে বোধগম্য নয় আদৌ সুকান্ত এরূপ কবিতা লিখতে গেলেন কেন? এবং এহেন অনুরাগীরা যখন অন্য কিছু না ভেবেই এই লাইনটা মন দিয়ে পড়েন—

'রক্তে বেজেছে উৎসব আজ হাত ধরো গান্ধীজী।'

তখন তাদের অন্তরাত্মা 'গেল গেল' রবে হাহাকার করে ওঠে। সুকান্ত ধরলো গান্ধীজির হাত? এতো দীন কিশোরের এক প্রৌঢ়ের হাত ধরা নয়। এতো এক আদর্শের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আদর্শের হাত ধরা। এ কেমন করে সম্ভব! একে তো অনেকেই সুকান্তকে কিশোর কবি বলেন। সে কথা মনে রেখে এহেন ব্যক্তিদের স্থিরপ্রত্যয় হয়, এ কবিতা নিশ্চয়ই সুকান্তর অপরিণত মস্তিষ্কের আরো অপরিণত চিন্তার এক ফসল।

কিন্তু যাঁরা সুকান্তকে একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করবেন, তাঁরা তাঁর মনেরই পরিচয় পাবেন ; পরিচয় পাবেন বয়সে কম হলেও তৎকালীন সুকান্ত সমসাময়িক বহু প্রাচীন নেতৃবৃন্দের থেকেও বোধ হয় প্রাজ্ঞ। বস্তুত,

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।

অনুভব (।। ১৯৪৬ ।।)

এ সুকান্তের কবিতা কাউকে বলে দিতে হবেনা।

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,

(রবীন্দ্রনাথের প্রতি)

হ্যাঁ, এ সুকান্তের কবিতা।

তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝল্‌সানো আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গর্জিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে।।

(১লা মে-র কবিতা' ৪৬)

এ লেখা সুকান্তের না হয়েই যায় না বলবেন সুকান্ত প্রেমীরা। কিন্তু এই সুকান্ত কি বলতে পারেন গান্ধীজিকে?

তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু-উত্তরণের শেষে
তোমাকে গড়ব প্রাচীর, ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে।

নিশ্চয়ই পারেন এবং সুকান্তের মতো কবিই বলতে পারেন এমন দুঃসাহসিকের মত কথা।
সুকান্ত সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণাটি কি?

সুকান্ত মার্কসবাদী চেনায় উদ্দীপ্ত সাম্যবাদী কবি এবং বিবেকান্দের সাম্যবাদ, নজরুলের সাম্যবাদ আর সুকান্তের সাম্যবাদ কোন মতেই এক নয়।

কাব্য কবিতা সম্পর্কে সুকান্তের নিজের ধারণাটা কি?

'বাংলাদেশের কবিরা কি চিত্তে ও চিন্তায়, ধ্যানে ও জ্ঞানে, প্রকাশে ও প্রেরণায়, জনসাধারণের অভাব, আহার, পীড়া, পীড়াযন্ত্রনায় মৃত্যু, মন্বন্তরকে প্রবলভাবে উপলব্ধি করেন? তাঁরা কি নিজেকে মনে করেন দুর্গত জনের মুখপাত্র? তাদের অনুক্ত ভাষাকে কি করেন নিজের ভাষায় ভাষান্তরিত? এক কথায় তাঁরা কি জনগণের কবি?'

এই জনগণের কবি হিসেবে যিনি নিজেকে উৎসর্গ করতে চান তিনি এক সময়ের জনগণের নেতাকে যদি প্রশংসা করেন, তাঁকে দেখে এগিয়ে চলার প্রেরণা পান তাহলে দোষটা কোথায়?

দোষটা হলো আমরা অনেক সময় কোন কোন নাম অকারণে সহ্য করতে পারি না। আমরা সময়ের পটভূমিকায় সেই নামকে দেখি না বলেই বোধ হয় আমাদের এই বিভ্রান্তি যেমন, গান্ধীজি। এই নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকেই ঠাট্টা করতে শুরু করেন, অর্থাৎ এক গালে চড় মারলে অন্য গাল বাড়িয়ে দাও। কিন্তু এটাই কি গান্ধীজির একমাত্র পরিচয়? একথা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি গান্ধীজি ভারতবর্ষের এক ঐতিহাসিক চরিত্র। একথা কি অস্বীকার করা চলে যে গান্ধীজির আহ্বানে একদিন আসমুদ্র হিমাচল সচল হয়েছিল? সত্যাগ্রহ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ভরত ছাড়ো আন্দোলনের ইতিহাস গান্ধীজিকে ছাড়া লেখা কি সম্ভব? আর এই সমস্ত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের পরাধীনতা দূরীকরণে গান্ধীজির অবদান শূন্য এই অভিমত কি মেনে নেওয়া যায়? মানা যায় না।

রাজনৈতিক চিন্তায় গান্ধীজি ও সুকান্তের আদর্শগত পার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু ১৯৪২ সালে গান্ধীজি যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিলেন তখন লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ

তাঁর নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এ তো ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং সুকান্ত যদি সে সময়ের মহানায়ক গান্ধীজিকে বরণ করে থাকেন তাহলে তাঁর চিন্তায় স্বচ্ছতাই প্রকাশ পায়। (প্রসঙ্গত স্মরণীয় গান্ধীজি হরিজন পত্রিকায় বলছেন "স্থূলভাবে বলিলে, স্বাধীনতা হইবে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয়। 'রাজনৈতিক' কথার অর্থ যে কোন প্রকারে বৃটিশ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তি।") সুতরাং বলা যেতে পারে কোন রকম গোঁড়ামির দ্বারা প্রভাবিত না হয়েই সাড়া দিয়ে সুকান্ত ঠিকই অনুভব করলেন।

'চল্লিশ কোটি জনতার জানি আমিও যে একজন।'

পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বরং সুকান্তের ভুল হল না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যিনি সঠিক নেতৃত্ব দেবেন তখন সুকান্ত তাঁকেই সমর্থন করবেন এটাই তো সঠিক চিন্তা। সেদিনের নেতা গান্ধীজির প্রতি যথোচিত সম্মানদানে কুণ্ঠা নেই সংগ্রামী সুকান্তের।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ লেনিন, মার্শাল তিতো ও গান্ধীজি প্রভৃতি মহাপুরুষ স্মরণে সুকান্ত যে কবিতাগুলি লিখেছেন কোনটিতেই তো ব্যক্তি পূজা নেই। ব্যক্তি মানুষের বন্দনা তিনি কখনোই করেননি।

লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।

(লেনিন)

তুমি শক্তির অটুট খনি
যুগোশ্লাভের প্রতিটি ঘরে
তুমি আছ জানি বন্ধু তিতো।

(মার্শাল তিতোর প্রতি)

এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্রঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ-সংগীতের সুর,
জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
চলুক নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে।

(পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে)

লেনিন, তিতো ও রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লেখা উপরের তিন কবিতা কোন ক্ষেত্রেই মহাপুরুষদের ব্যক্তিগত জীবন বন্দনা নয়। এর মধ্যে গতানুগতিক ভক্তির স্পর্শ নেই। ভক্তি বা শ্রদ্ধা যদি কিছু থাকে তো ঐ ঐ ব্যক্তির কর্ম সাধনার ভাবরূপের প্রতি। সুতরাং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা যে সুকান্তের মনে আগুন জ্বালিয়েছে। মন্বন্তর যে সুকান্তকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে, যে সুকান্ত বৃটিশের পরিকল্পিত অত্যাচার ও গণহত্যা দেখে শঙ্কিত হচ্ছিলেন তিনি যদি সামনে কোন নেতাকে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ধ্বনি দিয়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিতে দেখে থাকেন তো তাকে সমর্থন করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। সমর্থন না করলেই বরং গণ-সংগ্রাম থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন থাকতেন। অতএব মুক্তি সংগ্রামের নায়ক গান্ধীজিকে তিনি প্রশংসা করে নিজের মর্যাদা বাড়িয়েছেন এবং বিপ্লবী সুকান্তের বুঝতে

একটুও দেরী হয়নি যে দেশ যখন পরাধীন তখন তার রাজনৈতিক মুক্তি সর্বাগ্রে দরকার। কারণ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান না ঘটলে শোষণ মুক্তিও সম্ভব নয়। আর সেই শোষণ মুক্তির ডাক যদি গান্ধীজি দিয়ে থাকেন তো তাকে সমর্থন করার মধ্যে কোন আদর্শগত বিচ্যুতি থাকে না। বিশেষ করে যে আন্দোলন শুধু অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তাকে সমর্থন করাটাই সুকান্তের পক্ষে স্বাভাবিক।

বিদ্রোহী মানসিকতা তাঁর আছে বলেই গান্ধীজির নেতৃত্বে তিনি 'চল্লিশ কোটি জনতার' একজন হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বলতে পারেন—

'মনে হয় শুধু তোমারই মধ্যে আমরা যে বেঁচে আছি।'

কারণ মুক্ত স্বদেশের আকাঙ্ক্ষার কাঙাল সুকান্তের মনে পরাধীনতার হীনতার জ্বালা কত তীব্র ছিল তা ধরা পড়েছে নিম্নের এই কবিতায়—

অবাক পৃথিবী। অবাক করলে তুমি।
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।
অবাক পৃথিবী! আমরা যে পরাধীন
অবাক, কী দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন।

(অনুভব)

।।১৯৪০।।

সুতরাং বলতে পারি গান্ধীজির প্রতি সুকান্তের বিনম্র এই শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁর স্বকীয় আদর্শকে কালিমালিপ্ত না করে বা ভুষ্টিনাশ না ঘটিয়ে বরং গৌরবের শুভ্র মুকুটই পরিয়েছে।

পল্লী কবি জসীমউদ্দীন

কবির জন্মস্থান পল্লীগ্রাম হলেই তাঁকে পল্লীকবি বলা হবে এমন কোন কথা নেই। তাহলে বাংলা সাহিত্যে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পরে কেবল জসীমউদ্দীনের নামের আগেই বা এই বিশেষণটা দেওয়া হয় কেন? কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তাঁর কবিতায় ভাব, ভাষা ও রস সম্পূর্ণ নতুন ধরনের'। বলা বাহুল্য একটু পরিণত মন না হলে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মর্মার্থ অনুধাবন করা সহজ নয়।

তবু একটু ব্যাখ্যা করে বলি— তাঁর কাব্যের বিষয় অবিভক্ত পল্লী বাংলা— বিশেষত বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল। তাঁর নায়ক নায়িকারাও গ্রাম থেকে উঠে এসেছে। তিনি যখন গলা খুলে গান গাইতে চান তার আবহ তৈরি করে পল্লী বাংলার রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এবং একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে তাঁর সৃজন কাজ চলে। জসীমউদ্দীনের কাব্যে পর্দায় ভেসে ওঠে রাখাল ছেলে, রাখালি মেয়ে, শাকতুলুনি, বেদেনী, শ্যামলী, গ্রাম্য ছেলে, মেনাশেখ, বোশেখ শেষের মাঠ, সবুজ ধানক্ষেতে, নদীর ঘাট, ধূ ধূ বালুচর, সাজু, রূপাই, ডালিম গাছের তলে দাদীর কবর অথবা রঙিলা মাঝির দল।

তাঁর বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য— নক্সী কাঁথার মাঠ, রাখালী, বালুচর, ধানক্ষেত, সোজন বাদিয়ার ঘাট, মাগো জ্বালিয়ে রাখিস আলো, পদ্মাপার, মাটির কান্না ও রূপবতী। ''ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়'' স্মৃতিকথা।

বাংলাদেশ সরকারের ''একুশের পদক'' সম্মানপ্রাপ্ত রবীন্দ্রভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, লিট, উপাধিধারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের অধ্যাপক জসীমউদ্দীনের বিশ্বাস ছিল শিশুদের জন্য যেমন শিশু সাহিত্য তেমনি ''অশিক্ষিত জনসাধারণের'' জন্য একটা সাহিত্যের প্রয়োজন আছে। তাই তাঁর কাব্যে কোন প্রতীক নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উপভাষার পাঁচিল টপকাতে পারলেই অল্পশিক্ষিত জনসাধারণ তাঁর কাব্যরসে সহজেই অবগাহন করতে পারে। সেইজন্যে তাঁর কাব্যে দেহাতী, বাউল, মারফতী, মুর্শিদা ও ময়মনসিংহ গীতিকার প্রভাব দেখা যায়। হাটে মাঠে ঘাটে ঘুরে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোককাব্য থেকে তিনি প্রেরণা পান। তাঁর মুখেই মানায়—

> আমার গেঁয়ো মাঠটি আমার মক্কা হেনস্থান
> সাধকরে আজ লুটিয়ে সেথা জুড়াই সকল প্রাণ।

গ্রাম্য গান শিখতে চাইলে জসীমউদ্দীনের 'গ্রাম্য গান সংগ্রহ' আগ্রহ ভরে পড়তে হবে। এসব ক্ষেত্রে সাহিত্যিক বৈচিত্র্যের চেয়ে সুর বৈচিত্র্যের দিকে তাঁর নজর বেশি।

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' তাঁর একটি বিশেষ কাব্য। এখানে শুধু মুসলমান নায়ক সোজনের

সঙ্গে হিন্দু নায়িকা দুলীর প্রেমের করুণ কাহিনী বর্ণনাই প্রাধান্য পায়নি, বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান কৃষক সমাজের একটা নিখুঁত ছবিও ফুটে উঠেছে।

তবে শুধু একটি কাব্যগ্রন্থ দিয়ে জসীমউদ্দীনকে ছুঁতে চাইলে 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' পড়তেই হবে। বাপের বেটা রূপাই— ''গাখানি তাঁর শাওন মাসের যেমন তমাল তরু'। এই রূপাইয়ের সঙ্গে 'বউ টুবানী' ফুলকে রূপে হার মানানো সাজুর ভাব, ভালবাসা, বিবাহ ও বিচ্ছেদ নিয়ে এই অমর পল্লীকাব্য। পাশাপাশি দুটি গ্রামের ধান কাটা মারামারি, খুনোখুনির পরে রূপাই গাঁ ছাড়া হল। একবছর কাল ধরে সাজু তার প্রিয় রূপাইয়ের সুখস্মৃতি বুকে নিয়ে কাঁথায় ছবি আঁকে। অসুস্থ, দুর্বল, বিষণ্ণ সাজু মাকে কাতর মিনতি জানায়— 'সোনা মা আমার'।

এই কাঁথাখানি বিছাইয়া দিও আমার কবর পরে।
ভোরের শিশির কাঁদিয়া কাঁদিয়া এরি বুকে যাবে ঝরে।

সাজু মারা যায়। বহুদিন পরে গাঁয়ের লোকেরা বিদেশীকে সাজুর কবরের কাছে মৃত অবস্থায় দেখে। আরো দেখে—

সারা গায় তার জড়ায়ে রয়েছে সেই সে নক্‌সী কাঁথা।
এবং সেই হতে গাঁর নামটি হয়েছে নক্‌সী কাঁথার মাঠ।

গ্রন্থটি খ্যাতির তুঙ্গে ওঠে Mrs. E. M. Milford কর্তৃক 'The Field of the Embroidered Quilt' নামে অনূদিত হয়ে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেশ থেকে প্রকাশ পাবার পর।

এই গ্রন্থের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও জসীমউদ্দীনের নির্ভেজাল পল্লীপ্রীতির স্বীকৃতি।

সুকুমার-সম্ভোগ

একটা নাটকের সংলাপ দিয়ে শুরু করি।

কেষ্টা— 'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন'— মানে কি?

পণ্ডিত— 'আই' — 'আই' কিনা চক্ষুঃ, 'গো'— গয়ে ওকার গো— গৌ গাবৌ গাবঃ, ইত্যমরঃ 'আপ্' কিনা আপঃ সলিলং বারি অর্থাৎ জল— গরুর চক্ষের জল— অর্থাৎ কিনা গরু কাঁদিতেছে— কেন কাঁদিতেছে— না 'উই গো ডাউন' কিনা 'উই' অর্থাৎ যাকে বলে উইপোকা— 'গো ডাউন' অর্থাৎ গুদোমখানা— গুদোমঘরে উই ধরে আর কিছু রাখলে না— তাই না দেখে, 'আই গো আপ্'— গরু কেবলি কান্দিতেছে—

নাটকের নাম 'ঝালাপালা'। স্রষ্টা সুকুমার রায় জন্ম ৩০ অক্টোবর ১৮৮৭; মৃত্যু ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩। অর্থাৎ মাত্র ৩৫ বছর ১০ মাস ১০ দিন জীবৎকালে স্রষ্টা সুকুমার নাট্য রচনায় যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিলেন তার দ্বিতীয় নজির আমাদের সাহিত্যে নেই। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় ডবল অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পাশ করে পাঁচ বছর পরে ১৯১১ তে মুদ্রণশিল্পে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যাত্রা করেছিলেন সুকুমার রায়। কোন শিক্ষাই যে তাঁর ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণই তাঁর লেখা ও রেখায় ধরা রয়েছে।

প্যারীচাঁদ মিত্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিদ্বজ্জনেরা তাঁদের ছোটবেলার স্কুলে বিচিত্র ধরনের মাস্টার মশাইয়ের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন— 'ঝালাপালা' নাটকের ওই পণ্ডিত মশাইয়ের আর একটা উক্তি স্মরণ করা যাক যেখানে তিনি কেষ্টাকে একটা জায়গা বুঝিয়ে দিচ্ছেন এইভাবে—

'হুঁ, দেখি নিয়ে আয়, কোন জায়গাটা— সব বলে দিতে হবে। তোদের আর কিচ্ছু হবে না। 'ওয়ান্স্ আই মেট্ এ লেম্ ম্যান ইন এ স্ট্রিট নিয়ার মাই হাউস।' 'ওয়ান্স্ আই মেট এ লেম্ ম্যন'— কিনা একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল, 'ইন্ এ স্ট্রিট'— সে বিস্তর চেষ্টা করিল। 'নিয়ার মাই হাউস'— কিন্তু হাড় বাহির হইল না। এই সোজা ইয়েটা বুঝতে পাল্লি না? বলা বাহুল্য এই ব্যাখ্যা শুনে ঘটিরামের পালাতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু না পালিয়ে সে জানতে চেয়েছিল— 'এই চার সের আলুর দাম যদি দশ আনা হয় তবে আদ্ মোন্ পটলের দাম কত?' এর জন্য যোগ ভাগ থেকে জি-সি-এম পর্যন্ত করেও উত্তর মেলাতে পারেনি।

জীবন যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত আমাদের মত এই গোমরা মুখো রামগড়ুরের ছানাদের মুখে এক চিলতে হাসি ফোটানোর জন্য সুকুমার রায়ের এই মূল্যবান আরকের বোধহয় জুড়ি নেই।

রামায়ণের লক্ষ্মণের শক্তিশেল বৃত্তান্ত শুনে ভক্ত পাঠক-পাঠিকা চোখের জল রোধ করতে পারে না। কিন্তু সুকুমার রায়ের অভিনব শক্তিশেল-এর জাম্বুবান বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, মুখেন মারিতং জগৎ' এখানে হনুমান বাতাসা খায়, যমদূতের মাইনে বাকি পড়ে, সুগ্রীব জখম হয়ে

পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধে, বিভীষণের দাড়ির গন্ধে জাম্বুবানের বিরক্তি উদ্রেক করে। এখানে যমেরও মানুষ চিনতে ভুল হয়, তবে স্বীকার করে— 'আজ্ঞে চিত্রগুপ্ত ব্যাটা আমায় ভুল বুঝিয়ে দিয়েছিল। আমি এখুনি গিয়ে ব্যাটার চাকরি ঘুচোচ্ছি।' হাসির মোড়ক খুললে দেখা যাবে বাস্তব জগতে কত চিত্রগুপ্তের ভুল বোঝানোর জন্যে কত শক্তিমান যমরাজরূপী মালিকের দল কত ব্যাটার চাকরি ঘোচায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

এর পাশাপাশি কথা নিয়ে লোফালুফি করে হাস্যরস সৃষ্টিতে লিয়ারের মত তাঁর জুড়ি নেই। প্রমাণ 'অবাক জলপান'। নিদর্শন নিচে দেওয়া গেল।

পথিক। মশাই একটু জলপাই কোথায় বলতে পারেন? তার উত্তরে ঝুড়িওয়ালা শেষ পর্যন্ত কি বলেছিল?

'জল চাচ্ছেন তো 'জল' বললেই হয় 'জলপাই' বলার দরকার কি? জল আর জলপাই কি এক হল? আলু আর আলুবোখরা সমান? মাছ ও যা মাছরাঙাও তাই? বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন? চাল কিনতে গেলে কি চালতার খোঁজ করেন?'

আর বৃদ্ধ 'খাবার জল' কথায় কান না দিয়ে যে লিস্টি আউড়েছিল তাও কি কম মজার?— 'বিষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, জিবের জল, হুঁকোর জল, ফটিক জল, রোদে ঘেমে জল, আহ্লাদে গলে জ-ল, গায়ের রক্ত জ-ল, বুঝিয়ে দিল যেন জ-ল— কটা হয় গোনোনি বুঝি?'

গোনার দরকার হবে কি? গোনার আগেই তো আমাদের চক্ষু ছানাবড়া।

আবার 'চলচিত্তচঞ্চরী' কিংবা 'শব্দকল্পদ্রুমে' তিনি তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজপতি এবং নানাক্ষেত্রে গুরুবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এই ধারণা অমূলক না হওয়ারই সম্ভাবনা। সত্যি বলতে কি শব্দ নিয়ে যদৃচ্ছ খেলায় তিনি দোসরহীন। সেটা তাঁর কবিতা, গদ্য, নাটক সব ক্ষেত্রেই অভ্রান্ত সত্য।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য করার জন্য যাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সুকুমার রায়ও যে এঁদের পাশে বসার যোগ্য সেকথা আমরা ভুলে যাই। একটু নমুনা দিলেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। 'শরীরের মালমশলা' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সুকুমার রায় বলেছেন— 'বলতো কিসের তৈরি মানুষ? কিসের তৈরি একটু নমুনা শুনবে?'

'দুমন ওজনের একটি মানুষের শরীরের মধ্যে হিসাব করলে এক মন জল পাওয়া যাবে— বেশ বড় বড় তিন-চার কলসী জল। তার শরীরে যতরকম গ্যাস, বাষ্প বা বাতাস আছে তা যদি আলাদা করে বার করতে চাও তাহলে এত গ্যাস বেরাতে পারে যে তার জন্য বারো হাত লম্বা, বারো হাত চওড়া, আট হাত উঁচু একটা ঘর লাগবে। তার মধ্যে এমন অনেকখানি গ্যাস পাবে বাজারে যার দাম আছে— বিক্রি করতে পারলে প্রায় টাকা দশেক পাওয়া যায়।'

সুকুমার রায় যখন এ কথা লিখেছিলেন তখনকার দশ টাকার মূল্য এখন কত সে হিসেবে না গিয়েও বলা চলে যে আমরা যারা বিজ্ঞান বুঝিনা তাদের জন্য এর চেয়ে সহজে শরীরের মাল-মশলার হিসেব আর কীভাবে দেওয়া যেতে পারতো?

কিংবা হাস্যচ্ছলে বলা 'শ্রীগোবিন্দকথা'।

হাইড্রোজেনের দুই বাবাজি অক্সিজেনের
এক;
নৃত্য করেন গলাগলি কান্ডখানা দেখ্।
আহ্লাদেতে এক্‌শা হয়ে গলে হলেন জল;
এই সুযোগে সুবোধ শিশু শ্রীগোবিন্দ বল।

জলের ফর্মূলা H_2O। সুকুমার রায় হাইড্রোজেনের দুই পরমাণু ও অক্সিজেনের এক পরমাণুকে 'বাবাজি' বানিয়ে কাজ উদ্ধার করেছেন কত সহজে। তাছাড়া তার স্বভাবের মধ্যে যে 'বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য' লক্ষ্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার বিস্তর প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে 'সন্দেশ'-এর পৃষ্ঠায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে তাঁর জীবনের প্রায় এক চতুর্থাংশ জড়িয়ে রয়েছে সন্দেশ সম্পাদনার কাজে।

বিজ্ঞান চিন্তার পাশাপাশি শিশুদের নীতিশিক্ষা, ইতিহাস শিক্ষা ও মহাপুরুষদের জীবনী থেকে শিক্ষা নেবার কথা তিনি সুপরিকল্পিতভাবে চিন্তা করেছিলেন। তাই তাঁর ছোটদের জন্য লেখায় স্কটল্যান্ডের তাঁতির ঘরে জন্মে যে ডেভিড লিভিংস্টোন আফ্রিকার অজানা দেশ আবিষ্কার করেছিলেন তিনি যেমন বাদ পড়েন না তেমনি ইটালি দেশীয় নাবিক কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কাহিনীও বাদ পড়ে না। কত অজানা তথ্য অল্প কথায় পরিবেশন করেছেন তা এই ছোট্ট প্রবন্ধে বলা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই সূত্রে তিনি জানিয়েছেন ফ্রান্সের এক নগন্য কৃষকের মেয়ে জোয়ান কীভাবে দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে জ্বরে ও যন্ত্রণায় কাতর স্যার ফিলিপস্ সিডনি পিপাসার্ত হয়েও পাশ্ববর্তী সৈনিককে জল দিয়েছেন এই ভেবে 'Thy need is greater than mine'। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে তিনি আখা দিয়েছেন Sister of Mercy। গ্রীস দেশের এথেন্স নগরের কুশ্রী ছেলে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে কীভাবে বিষপানে মৃত্যুবরণ করলেন। স্কটল্যান্ডের কর্নেগী পিওনের কাজ থেকে টেলিগ্রাফ শিখে পরে রেলগাড়ি আর খনির তেলের ব্যবসা করে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করে 'দানবীর' উপাধি পেলেন। জগতে শান্তি স্থাপনের জনন্য জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের জন্য নোবেল প্রাইজ দানকারী আলফ্রেড নোবেল সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত উক্তি— ডিনামাইট আবিষ্কারক আলফ্রেড ও নেপোলিয়ানের মত বলতে পারতেন— 'there shall be no Alps'। এমনিভাবে, আর্কিমিডিস, গ্যালিলিও, ডারউইন, মাইকেল ফ্যারাডে, আইজ্যাক নিউটন, এডিসন, জগদীশচন্দ্র বসু, মাটি খুঁড়ে মাথার খুলি আবিষ্কারক পিল্ট ডাউন, রবার্ট ব্রুস, গ্যালভানি বা সেলাইকলের ইতিহাসের আবিষ্কারক আমেরিকার এলিয়াস হাউসকে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

তেমনি জীব-জন্তু সম্পর্কেও তাঁর অদম্য কৌতূহল ছিল। এই তালিকায় গরিলা, বেবুন, সিন্ধুঘোটক, ঘোড়া, বাদুড়, তিমি, রাক্ষুসে মাছ, বিদ্যুৎ মৎস্য, সমুদ্রের ঘোড়া, কুমিরের জাতভাই টিকটিকি, গিরগিটি, বহুরূপী, তক্ষক, গোসাপ থেকে চোর এবং পেটুক গ্লাটন বা দক্ষিণ আমেরিকার শূয়োর পেকারিও ঠাঁই পেয়েছে। লেখার ঢংটিও খুব প্রশংসাজনক। যেমন বিভারের প্রধান আশ্চর্য কীর্তি নদীর বাঁধ বা ওরাং ওটাং সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য— 'বন্ধুটির নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত ওরাংচন্দ্র ওটাং'।

আবার নীহারিকা, ক্লোরোফর্ম, কয়লার কথা, পিরামিড, ভূমিকম্প, মেঘবৃষ্টি, আগুন, লোহা, কাঁচ ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ সরস রচনা শিশুদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহের সাক্ষ্য দেয়।

তবে সুকুমার রায়ের প্রধান খ্যাতি তাঁর ননসেন্স ভার্স-এর জন্য। পাশ্চাত্য দেশে এডওয়ার্ড লিয়র, লুইস ক্যারলের মত আমাদের ত্রৈলোক্যনাথও এ ধরনের লেখার জন্য খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সুকুমার রায় অনন্য এবং একক। উপেন্দ্রকিশোর বা গুটেনবার্গ এর উত্তরাধিকার যেমন চিত্রশিল্পী সুকুমার রায়কে গড়ে তুলেছে তেমনি বিজ্ঞানের জারক রসে জারিয়ে হাসির ভিয়েন চড়িয়ে সুকুমার সৃষ্টি করেছেন অপূর্ব খেয়াল রস।

'আবোল তাবোল' গ্রন্থের 'খিচুড়ি' কবিতার দুটি ছত্র স্মরণ করা যাক—

হাঁস ছিল সজারু, (ব্যাকরণ মানিনা)
হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানিনা।

ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন জানিয়েছেন, সুনীতি চট্টোপ্যাধ্যায়ের কাছে সুকুমার রায় এইসব উদ্ভট কৃত্রিম শব্দের হদিশ পেয়েছিলেন। এই শব্দগুলোকে বলা হয় পোর্টম্যান্টো শব্দ। এইভাবেই তৈরি হয় বকচ্ছপ, মোরগরু, গিরগিটিয়া, সিংহরিণ, হাতিমি। কিন্তু শুধু নামকরণেই রস সৃষ্টি নয়, এডওয়ার্ড লিয়রের মত নিজের আঁকা ছবিগুলো না দেখলে অর্ধেক রস উবে যায়।

শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন, 'নাক' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন রুশ লেখক গোগোল (১৮০৯-৫২)। সে-গল্পে একজন লোকের নাক যায় হারিয়ে, পুলিস আবার খুঁজে বার করে সেই নাক। কিন্তু গোটা গল্পে তা এমন এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পেয়ে যায় যে সবারই সামনে তৈরি হয়ে ওঠে এই এক ফ্যান্টাসি— লোকটিরই ওই নাক নয়, নাকটিরই ওই লোক। ওর সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই বুঝি—

গোঁফকে বলে তোমার আমার— গোঁফ কি কারো কেনা?
গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।

'গানের গুঁতো'র ঠেলায় আমরা অনেকে অস্থির হই। 'ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে' আমাদের ব্যথা হয়। এগুলো নামেই ননসেন্স ভার্স। আসলে একটু তলিয়ে রঞ্জনরশ্মি ফেললেই আমরা নিজেদেরকে দেখি অনেক সময়। আমরা জানি গাধা শুধু গাধা নয়, এরই রকমফের পাবো অতিবিজ্ঞানী মানুষের ব্যবহারে, চন্ডীদাশের খুড়োর কলে। শঙ্খ ঘোষের ব্যাখ্যাটি এখানে চমৎকার। গাধাটির সামনে ছিল মুলো আর চন্ডীদাশের খুড়োটি আপন-আপন রুচিমত মন্ডা-মিঠাই চপকাটলেট খাজা কিংবা লুচি যে কোনটাই সাজিয়ে রাখার কল তৈরি করেছিলেন, যে কল সামনে থাকলে মন বলে তায় খাবো খাবো, মুখ চলে যায় খেতে, মুখের সঙ্গে খাবার ছোটে পাল্লা দিয়ে মেতে। দৌড়ের আর শেষ থাকে না। আধুনিক যুগে আমরাও চাই চাই আরও চাই করে দৌড়ে চলেছি অথচ ধরতে পারছি না। সুতরাং সুকুমার রায় আজও কি প্রাসঙ্গিক নয়?

বাবুরাম সাপুড়ে, কুমড়ো পটাশ, ন্যাড়া বেলতলায় যায় কবার, হুঁকোমুখো হ্যাংলা, গন্ধবিচার, ট্যাশগরু, নোট বই, রামগড়ুরের ছানা কোনটার নাম করবো আর না করবো ঠিক করা মুশকিল।

'খাই খাই' কাব্যগ্রন্থে শুধু খাবার কথাতেই ভর্তি নয়। কাজের কথা এখানে কম নেই। 'কাজের লোক' কবিতায় 'বাঃ আমার নাম বাঃ'-তে শুধু বাঃ, যদি, বটে, কিন্তু ইত্যাদি অব্যয়

নিয়ে কারবার করতে গিয়ে 'তবু'কে প্রশংসা করলেন। শুধু ভাগ্যের উপর ছেড়ে না দিয়ে প্রকৃত কর্মীদের প্রশংসা এই কবিতায়। 'নিষ্কর্ম্মারা গেল কোথা, পালাল কোন দেশে?...... সময়টা যে কাজে লাগায় চালাক বলে তায়।' ঠিক তেমনি 'মুর্খ মাছি' কবিতায় 'দুষ্টলোকের মিষ্টি কথায়/নাচলে লোকের স্বস্তি কোথায়?' তেমনি 'জীবনের হিসাব' কবিতায় বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই 'মাঝিরে কন বলতে পারিস সূর্যি কেন ওঠে?/চাঁদটা কেন বাড়েকমে? জোয়ার কেন আসে, নদীর ধারা কেমনে আসে সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন? এমনধারা কতশত প্রশ্ন। কিন্তু যখন ঝড় উঠেছে, ঢেউ উঠেছে দুলে— মাঝি বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাইকে সাঁতার জানে কিনা জানতে চেয়েছিল এবং এতক্ষণ যে বাবুমাশাই মাঝির জীবন বারো আনাই বৃথা বলেছিলেন সেই মাঝি মোক্ষম কথা শুনিয়েছে—

বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব কোর পিছে
তোমার দেখি জীবনখানা ষোলআনাই মিছে।'

সেই ১৯২০ সালে সুকুমার রায় লিখেছেন কোন বন্ধুকে— ' এই যুগে মানুষের মন থেকে আশার প্রদীপ নিভে গিয়েছে, কেউ আশা করতে জানে না, কেউ ভবিষ্যতের ভরসা রাখে না।' তাই কি হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে সকলের মুখে আনন্দ ঝরিয়ে নিজে আনন্দিত হতে চেয়েছেন শিল্পী সুকুমার? 'হযবরল'-তে শুধু কি হাসিরই কথা। যে হিজিবিজবিজ বলে 'আমার নাম হিজিবিজিবিজ, আমার ভাইয়ের নাম হিজিবিজবিজ, আমার বাবার নাম হিজিবিজবিজ, আমার নিজের নাম হিজিবিজবিজ, অর্থাৎ যার গুষ্টিসুদ্ধ সবাই হিজিবিজবিজ সে যখন বলে 'একজনের মাথার ব্যামো ছিল, সে সব জিনিসের নামকরণ করত। তার জুতোর নাম ছিল অবিমৃষ্যকারিতা, তার ছাতার নাম ছিল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তার গাড়ুর নাম ছিল পরমকল্যাণবরেষু— কিন্তু যেই তার বাড়ির নাম দিয়েছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অমনি ভূমিকম্প হয়ে বাড়ি টাড়ি সব পড়ে গিয়েছে। 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' আমরাও এমনিভাবে ধুলিসাৎ হইনা!

শব্দ ব্যবহারে সুকুমার রায় ভাষাতাত্ত্বিক-দেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার প্রমাণ সুভা ভট্টাচার্যের উক্তি— 'সুকুমার রায়ের 'হযবরল' বইয়ের প্রথম পাতাতেই আছে সেই আজব বিড়ালের প্যাঁট প্যাঁট করে তাকানো আর ফ্যাচফেচে হাসি। প্যাঁট প্যাঁট করে তাকানো কি শুধুই চোখ বড় করে তাকানো? তার অতিরিক্ত কিছু নয় কি? আর ফ্যাচ-ফ্যাচ করে কেউ হাসলে সেই হাসিকে সরল নির্মল নির্দোষ হাসি বলা যাবে কি?'

শ্রী কাকেশ্বর কুচকুচে ৪১ নম্বর গেছোবাজার, কাগেয়াপটি যার ঠিকানা তার মত 'পাগলা দাশু' আমাদের সমানপ্রিয়। মাস্টার মশাইয়ের মুদ্রাদোষ বা দুর্বলতা নিয়ে ব্যঙ্গ করা ছেলেমেয়ে সব যুগেই দেখা যায়। পাগলা দাশুর চেহারা কেমন?

ক্ষীণ দেহ খর্বকায় মুন্ড তাহে ভারি।
যশোরের কই যেন নরমূর্তি-ধারি।

নিজের চেহারা নিয়ে সে রঙ ফলিয়ে বন্ধুদের কাছে গল্প করে— ছাদে আমসত্ত্ব শুকোতে দিলে সে তার চেহারাখানা বার দুয়েক দেখিয়ে আসে। তাতেই কাকেরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করে। পন্ডিতমশাইয়ের ঘুমানোর সুযোগে তারা কাটকুট খেলে বা দশপঁচিশ খেলে, আবার রামপদর মিহিদানার হাঁড়িতে চিনে পটকা ফাটিয়ে পন্ডিতমশাইকে হাইজাম্প দেওয়ায়। ছবিখানা না দেখলে অর্ধেক রস নষ্ট। বর্তমান অরণ্যদেব টিনটিনের যুগে পাগলা

দাশুর খ্যাতির কিছুটা ম্লান হলেও একদা কিশোর বহু পাঠকের কাছে পাগলা দাশু আজও একক এবং অনন্য।

সুকুমার রায়ের ব্যাঙ্গের অন্যতম উপলক্ষ্য ছিল রাজতন্ত্র। তা বোম্বাগড়ের রাজা হোক বা ড্রিঘাংচুর রাজাই হোক। ড্রিঘাংচুর রাজা পাত্র মিত্র, আমীর ওমরা, সিপাই সান্ত্রি নিয়ে বসে আছেন, এমন সময় শব্দ হল এক দাঁড়কাকের গম্ভীর গলায় কঃ। এই নিয়ে গল্পের শুরু। এই গল্পে রাজপন্ডিতদেরও গালাগালি দিয়েছেন সুকুমার রায়। ড্রিঘাংচু যখন রাজামশাইয়ের কাছে আসে দেখতে নাকি দাঁড়কাকের মত। অচেনা লোকটা, যে মন্ত্র দিয়েছিল রাজামশাইকে তাতে লেখা ছিল—

হল্‌দে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎ পটাং
মুসকিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।

দু'দিন উপোষ করে তিনদিনের দিন সকাল বেলায় রাজা এই লেখা পড়েও কোনরকম আশ্চর্য কিছু হয় কিনা লক্ষ্য করতেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত ড্রিঘাংচুর সন্ধান তিনি পাননি। আজকের দিনে রাজতন্ত্র নেই কিন্তু শাসকবর্গ নিজেদের আচরণে অনুরূপ হাস্যকর আচরণ করেন না কি? যদি করেন তাহলে আজও সুকুমার রায় ফুরিয়ে যান নি।

সুকুমার রায়, লুইস ক্যারল বা এডওয়ার্ড লিয়র (The Father of English Nonsense) নন একথা মনে রেখেও তাঁর সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে নন্‌সেন্স ক্লাবের নাম করতেই হয়, নচেৎ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই ক্লাব পরে মন্‌ডে ক্লাব বা মন্ডা ক্লাবে পরিণত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কবি সত্যেন্দ্র দত্ত, ভাষাবিদ্ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সমালোচক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তকুমার মহলানবিশ এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন। এই ক্লাবের বিজ্ঞাপন ও ছবি একে অপরের পরিপূরক। লোভ সংবরণ করেও একটা বাংলা এবং একটি ইংরেজি বিজ্ঞাপনের নিদর্শন নিচে দেওয়া গেল—

(ক) সম্পাদক বেয়াকুব/কোথা যে দিয়েছে ডুব
এদিকেতে হায় হায়/ক্লাবটিও যায় যায়।
তাই বলি সোমবারে/মদ্‌গৃহে গড় পারে
দিলে সবে পদধূলি/ক্লাবটিরে ঠেলে তুলি
রকমারি পুঁথি কত/নিজ নিজ রুচি মত
আনিবেন সাথে সবে/কিছু কিছু পাঠ হবে
করজোড়ে বারবার/নিবেদিছে সুকুমার।

(খ) "খায় ত খায়"

Anuual Meeting
Monday September 2. 1. 1918, at 630 P.M.
100, Gurpar Road
Agenda of Business

1. The Secretary to present his annual mis-statements.

2. Professor Siddhanta to move: to adopt or not to adopt-that is the question"

3. Giban Babu to protest "Is this a report? If so, why not?"

4. Khodan Babu to propose "That in the interest of plain living and high thinking, tea & biscuits" Loud distrubance.

5. Strom of protest chorus led by Jungli Babu. God save the Secretary!

সম্পাদক সুকুমার রায়ের রসসিক্ত মন বাংলা ও ইংরেজি বিজ্ঞাপনের ভাষায় পরিষ্কার ধরা পড়েছে।

আজীবন যিনি হাস্যরসের ছটায় রামগড়ুরের ছানাদের ব্যঙ্গ করেছেন, আবোল তাবোলের শেষ কবিতায় সেই সুকুমার রায় লিখছেন—

আদিমকালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

তাঁর সুযোগ্য পুত্র বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ভাষায় বলি, 'জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়ে এমন রসিকতা আর কোন রসস্রষ্টার পক্ষে সম্ভব হয়েছে বলে আমার জানা নেই।'

অণুগল্পে বনফুল

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, যিনি বনফুল নামে সমধিক পরিচিত, উপন্যাস লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন, বড়ো গল্প লিখেছেন কিন্তু অণুগল্পে তিনি এক স্বতন্ত্র প্রতিভার অধিকারী। এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য অবশ্য তাঁর কোন অহংকার ছিল না কিন্তু তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন এই লেখাগুলো কে যেন তাঁর ঘাড় ধরে লিখিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে এই গল্পগুলোর জন্য তাঁর বহুপঠন বা ঘাম ঝরানো শ্রমের প্রয়োজন হয়নি বরং এগুলো যেন স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর লেখনী থেকে বের হয়ে সাহিত্যের সম্পত্তি হয়েছে।

বনফুল নিজেই লিখেছেন 'ছোট গল্প-রসিক পাঠক পাঠিকা আমাদের দেশে কম। একগাদা পান্তাভাত খাইয়া যাহার তৃপ্তি হয়, সে একটু আঙুর কিংবা একটি আপেল খাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না।' বনফুলের সন্দেহ যে অমূলক তার প্রমাণ তাঁর এই 'আঙুর' বা 'আপেল' সদৃশ গল্পগুলির প্রতি বাঙালি পাঠক পাঠিকার অকুণ্ঠ ভালবাসা।

ছোট গল্প এমনিতেই তো বাংলা সাহিত্যে ইংরেজি Short story-এর হাত ধরে এসেছে। এসেছে যুগের দাবিতে। সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে সাহিত্যের এই পরিসর পাঠকের মনোহরণ করেছে। ব্যস্ত মানুষের কর্মস্থলে পৌঁছানোর পথে বাসে ট্রামে ট্রেনে বসে সাহিত্য রস আস্বাদনের প্রয়োজন মেটানোর দাবি নিয়েই ছোট গল্পের আবির্ভাব।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোট গল্পের জন্ম, কৈশোর, যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বও। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র প্রভাবিত হয়েও বা রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হয়ে অসংখ্য লেখক তাদের বৈচিত্র্যের ডালি নিয়ে বাংলা ছোট গল্পের ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু বনফুলের বৈশিষ্ট্যই হল যে তিনি ছোট গল্পে প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব নন। আবার তারাশঙ্কর, মাণিক বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও নন। আকারে নন প্রকারেও নন। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' আকারে অনেক বড় কিন্তু প্রকারে সার্থক প্রথম শ্রেণীর ছোট গল্প। আমাদের বক্তব্য বিশেষত অণুগল্পে বনফুল যেন একটি স্বতন্ত্র ঘরানা তৈরি করেছেন। একালের বই মেলায় যে সমস্ত তরুণ তরুণী "পরমাণু গল্প" লিখে নতুনত্ব সৃষ্টির চমক দেখায়, তাঁরা নিঃসন্দেহে বনফুলকে গুরু বলে মনে নেবেন।

ছোট গল্প ঠিক কেমন ধরনের হবে এই নিয়ে সারা পৃথিবীতে সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে নানা মত আছে। সত্যি কথা বলতে কি কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় বেঁধে রাখা যায়ও না। প্রতিভাবানরা নিজেরা পথ তৈরি করে নেয়। ছোট গল্প বনফুলের দৃষ্টিতে কেমন সে সম্পর্কে কবিতার মত বনফুলেরই একটা ছোট লেখা আছে। সে লেখা থেকে জানতে পারি---

নদীর বুকে আলোর ঝলক,
গালের উপর চূর্ণ অলক,

মুচকি হাসি, ত্রস্ত পলক,
হলদে পাখির "টিউ'।

....

জোনাকীদের নেবায় জ্বলায়
রূপসীদের ছলায় কলায়
প্রতিদিনের থামায় চলায়
ছোট গল্প আছে।

অর্থাৎ ছোট গল্পের উপকরণের জন্যে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করার প্রয়োজন নেই। দেখার চোখ থাকলে উপকরণ আমাদের আশেপাশেই ছড়িয়ে আছে। সেই চোখ বনফুলের ছিল। সরোজ মোহন মিত্র বনফুলের এই বৈশিষ্ট্যকে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। — "মানব জীবনের স্রোত কত বিচিত্রধারায় প্রবহমান। বনফুল যেন তাঁর তীরে বসে মাছ রাঙা পাখির মত একটা উঁচু জায়গা থেকে অনবরত নিরীক্ষণ করে চলেছেন গল্প ধরার মুহূর্তকে তুলে আনতে।" এবং এই নিরীক্ষণ শক্তিতে যেসব গল্প উঠে এসেছে সেগুলির কোনটি চরিত্র প্রধান, কোনটি মনস্তত্ব প্রধান; কোথাও বা চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা প্রধান কিছু সংখ্যক গল্পে সমাজ সমস্যা থাকলেও রঙ্গ-ব্যঙ্গ প্রধান গল্পের তাঁর অভাব নেই। রূপক এবং প্রতীক ধর্মী গল্প যেমন তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেছে, তেমনি কিছু গল্পে পশুপ্রীতি ও সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায়না। নিজের গল্পের লেখার কৌশলকে বর্ণনা করতে গিয়ে বনফুল লিখেছেন, 'অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরে শিল্পের সুষমা নষ্ট হয়', এই স্বগতোক্তি যে এতটুকুও মিথ্যা নয় তা কয়েকটি গল্প বিশ্লেষণ করে বোঝা যেতে পারে।

'সুলেখার ক্রন্দনে' বনফুলের অণুগল্পের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিধৃত। গল্পের প্রথম ছত্র— সুলেখা কাঁদিতেছে। ষোড়শী তন্বী বিবাহিতা সুলেখার ক্রন্দনের কারণের দিকে পাঠকের নজরকে বিস্তৃত করেন সুকৌশলে লেখক।

কেন এই ক্রন্দন। পুত্রশোক, শাড়ি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মতভেদ, পছন্দসই সিনেমায় না যেতে পারার জন্য অভিমান না বিবাহপূর্ব কুমারী জীবনের কোন মধুর স্মৃতিজনিত বেদনা? নানা জল্পনা কল্পনার সুযোগ দিয়ে উপসংহারে যখন ব্যস্ত-সমস্ত শঙ্কিত বিপিন জিগ্যেস করে 'দাঁতের ব্যথাটা কমেছে? উত্তর— না। বড্ড কন্ কন্ করছে,' তখন যেন পাঠক স্বর্গ থেকে একেবারে পপাত ধরণীতলে।

মোপাসাঁ সুলভ এই উপসংহার, এই মোচড় এই অচিন্তিত পূর্ব চমক বনফুলের এই ধরনের গল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় গল্পের শেষ ছত্রে না পৌছানো পর্যন্ত পাঠক কিছু অনুমান করতেই পারছে না। অথচ উপসংহারে পাঠকের মন ভরে যায় অনাবিল আনন্দে। পাঠকের এই আনন্দোচ্ছল মুখ দেখার জন্য বনফুলের সমস্ত আয়োজন।

এই ধরনের গল্পকে সুকুমার সেন বলেছেন তাঁর গল্পগুলো 'ইংরেজীতে five minute short story আর আমেরিকান সাহিত্যিক গ্রাম্যভাষায় short story' —'অজান্তে' গল্পে বক্তার এক অন্ধ বোবা ভিখারির বেধড়ক ধাক্কা খেয়ে লাফ মারার পর রাস্কেল সম্বোধনের জন্য অনুশোচনায় মন ভারাক্রান্ত হয়। গল্প শেষ হবার আগে অনিচ্ছাকৃত ধাক্কা দেওয়া

লোকটির স্বরূপ উদঘাটিত হয় না। মোহিত লাল হয়তো এই জাতীয় গল্পকে 'চুটকি গল্প' আখ্যা দেবেন। কিন্তু এই গল্পও নিমেষেই পাঠকের মন কেড়ে নেয়।

'নিমগাছ' গল্পে বনফুল কবি এবং দার্শনিক। নিমগাছের ছাল, পাতা, ডাল কোনটাই ফেলনা নয়। কবিরাজরা নিমগাছের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হঠাৎ একদিন একটা নুতন ধরনের লোক এল যে কবিরাজ নয় কবি। লেখকের ভাষায় 'নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায় কিন্তু পারলেনা। মাটির ভিতর শিকড় অনেকদূরে চলে গেছে। বাড়ির আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ির গৃহকর্ম— নিপুণা লক্ষ্মী বউটার এই দশা।'

কবি-দার্শনিক বনফুল এই গল্পে নিমগাছের সমান্তরাল লক্ষ্মী বউয়ের গল্পের মাধ্যমে মুক্তির বাসনা ব্যক্ত করেছেন।

'বুধ্‌নী' একটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প। বিলটু জংলী বুধ্‌নীকে প্রাণ দিয়ে ভাল বাসত। বাঁশের বাঁশি সম্বল করে টকটকে লাল দুল খোঁপায় গাঁথা বুধ্‌নিকে সে বিভোর হয়ে দেখত। কিন্তু এই বুধ্‌নি যখন মা হল, তখন সদ্যোজাত সন্তানকে তার ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে হত্যা করে ফাঁসির অপেক্ষায় দিন গুণছে বিলটু। মৃত্যুর আগে ভুলেও ভগবানের নাম মুখে আনেনি বরং বুধ্‌নি বুধ্‌নি করেই বাকি সময়টা কাটিয়ে দেয়।

'দর্জি' গল্পের চমক মহাত্মাজিকে নিয়ে। মহাত্মাজি 'পাস' করবেন বলে বেশি চার্জ দিয়েও নির্মল, পঞ্চাশটা তেরঙ্গা পতাকা নেয়। গল্পের শেষেও একই দৃশ্য— মহাত্মাজি 'পাস' করবেন, ডবল মজুরি দিয়েও পঞ্চাশটা ফ্লাগ চায়। তবে এবারে ত্রিবর্ণ পতাকা নয়। কৃষ্ণবর্ণ পতাকা।

'জৈবিক নিয়ম' গল্পে এক রোগা যুবক স্টেশনে অপেক্ষমান এক তরুণীকে দেখিয়ে চানাচুর ওয়ালার সব চানাচুর কেনে। সোডা ওয়াটার খায়, কুলিকে ছোট্ট স্যুটসেকের জন্য চার পয়সার বদলে চারটাকা দেবে বলে এবং শেষে বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে চাকার নিচে পড়ে। গল্প শেষে লেখকের নিরাসক্ত মন্তব্য, 'আর কিছু করিবার সুযোগ সে পাইলনা'।

'পাঠকের মৃত্যু' গল্পে দেখি দশ বছর আগে যে উপন্যাস গোগ্রাসে গেলার লোভে পাঠক ট্রেন ছেড়ে দেয়, দশ বছর পরে সেই উপন্যাস রাবিশ মনে হওয়ায় প্রমাণিত হয় সেদিনের সে পাঠকের কবে মৃত্যু হয়েছে।

পরিমল গোস্বামী লিখেছেন 'হাতি থেকে প্রজাপতি সব রকম গল্প সৃষ্টির ব্রহ্মা হয়ে বসে আছ তুমি'। প্রমাণ বনফুলের 'গণেশ জননী'। নারীর প্রিয় গয়না বন্ধক দিয়েও এক নিম্ন মধ্যবিত্ত দম্পতির অভিমানবশে-অন্নজল-ত্যাগকারী গণেশকে বাঁচানোর যে আন্তরিক প্রমাণ গল্পটিতে দেখা যায় তা পাঠককে যেমন চমকে দেয় তেমনি সন্তানতুল্য এক হাতির জন্য উদ্‌বিগ্ন জননীর স্রষ্টা 'ফি' প্রত্যাখ্যানকারী লেখককেও চিনিয়ে দেয়।

'ছোটলোক' গল্পের উন্নতমস্তক রাঘবসরকার ও রিক্সাওয়ালার কথোপকথন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। নেতৃস্থানীয় রাঘবের মাথায় বলশেভিজম, ধনিকবাদ, দরিদ্র-নারায়ণ, ডিভিশন অব লেবার অনেক কিছু ভিড় করে আছে। কিন্তু মানুষে টানা রিক্সা চড়ায় তাঁর ঘোরতর আপত্তি। গল্পের শেষে হতে-পারতো-আরোহী অনমনীয় রাঘব রিক্সা না চড়েও ছ'পয়সা ভাড়া দিতে চায় তখন ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করে অস্থিচর্মসার রিক্সাওয়ালা।

গল্পটিতে 'রিক্সা চড়া পাপ' ধারণা সম্পন্ন লোকটির প্রতি লেখকের ব্যঙ্গও যেমন স্পষ্ট

তেমনি শ্রমজীবী মানুষের আত্মমর্যাদাকে বনফুল যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেন। মপাসাঁ বা ও'হেনরির মত এই জাতীয় whip crack ending বনফুলের বহু গল্পেই দেখা যায়।

প্রথম শ্রেণীর গল্প বিদ্যুৎচমকের মতো। এমন একটি গল্প 'ক্যানভাসার'। এই গল্পে দুটি মূল চরিত্র। এক, অর্থাভাবে স্ত্রী কাত্যায়নীর একটি সৌখীন শাড়ি জোটাতে না পারা বেকার ভৈরব। দুই, জীবন যন্ত্রণায় হার-না-মানা ক্যানভাসার হীরালাল। ভুলক্রমে 'ওভার ক্যারেড' হয়ে পল্লীগ্রামে এসে নিমের দাঁতন-ঘষা ভৈরবকে দাঁতের মাজন গছাবার প্রাণপণ চেষ্টা। এই নিয়ে তর্কাতর্কি এবং শেষে হীরালালের গন্ডদেশে ভৈরবের চপেটাঘাত।

'ভৈরবের ব্যবহার আশ্চর্যজনক, সন্দেহ নাই।

কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্যজনক আর এক কান্ড ঘটিল। চড় খাইয়া হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে ফোকলা হইয়া গেল। তাহার বাঁধানো দন্তপাটি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।' স্তম্ভিত ভৈরব হীরালালের কালো কুচকুচে গোঁফ জোড়ার দিকে চেয়ে থাকায় হীরালাল জানায় ওটাও কলপের গুণে। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলে মারা যাওয়ায় এই মাজন ও কলপ বেচে তার সংসার চলে। গল্পের শেষে বদমেজাজি ভৈরব যখন বলে 'আচ্ছা, দিন এক কৌটা মাজন'— তখন সে দরিদ্র অসহায় হীরালালের জীবন যন্ত্রণার শরিক হয়ে যায়।

বনফুলের চিকিৎসক সত্তার নিরাবরণ প্রকাশ দেখি 'নাথুনির মা' গল্পে। শাশুড়ি ও বউয়ের ঝগড়ার সময় 'পোড়ার' কথা উচ্চারণের পর সেই যে শাশুড়ির গাল হাঁ হয়ে যায় তা আর বোঁজে না। অগত্যা ডাক্তার বনফুলের শরণাপন্ন হওয়া। অভিজ্ঞ ডাক্তারের বুঝতে দেরি হল না— এটা Lock Jaw-- Dislocation of mandible। চিকিৎসার শেষে 'হাঁ' হওয়া গাল যখন বুঁজল তখন ময়দা কলে চাকরি করা নাথুনির মুখরা মার মুখ থেকে 'মুখী' শব্দ উচ্চারিত হল। অর্থাৎ এত যন্ত্রণার মধ্যেও শাশুড়ির 'পোড়ার মুখী' গালাগালি বিস্মরণ হয়নি। এমন নাটকীয় উপসংহার বনফুলের পক্ষেই সম্ভব। গল্প শেষে স্মিতহাস্যময় বনফুলের মুখ ভুলতে পারেনা সুরসিক পাঠক।

সমসাময়িক কালের সাধারণ প্রণয়োপন্যাসের প্রতি কটাক্ষ করে সুরসিক রাজশেখর বসু একটি ইংরেজি ছড়া তুলেছিলেন—

Mister		Miss
Meet		Kiss
More		Kisses
Mr	&	Mrs.

এই মামুলি প্রেমের গল্পের বদলে বনফুলের সৃষ্ট গল্পের প্রশংসা করে রাজশেখর লিখেছেন—

> 'অতিকায় প্রাণীর মতন কালবশে মহাকাব্য লোপ পেয়েছে। আমার বিশ্বাস, মহোপন্যাস ও ক্রমশ লোপ পাবে, ছোট রচনাতেই সুধীজনের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হবে। ভুরিভোজী পাঠক-পাঠিকার জন্য আপনি 'জঙ্গম' লিখে প্রচুর ক্যালরি সরবরাহ করুন। কিন্তু মিতাহারীও অনেক আছে, তাদের জন্য নানাবিধ জীবনীর রস ও লঘুমাত্রায় পরিবেশন করতে থাকুন।'

বলাবাহুল্য বনফুল রাজশেখরের অনুরোধ শিরোধার্য করে যে অসংখ্য ভিন্ন রসের অণুগল্প সৃষ্টি করেছেন তাতে আমরা আপ্লুত, পরিতৃপ্ত এবং প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আমাদের ঘনাদা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অমর সৃষ্টি ঘনশ্যাম দাস ওরফে ঘনাদা বাংলা সাহিত্যের-পাঠকদের কাছে এক অতি প্রিয় চরিত্র। চেহারায় তিনি উত্তম কুমার ছিলেন না। বয়সের হিসাব পাওয়া মুশকিল। লেখকের ভাষায় ঘনাদার 'রোগা, লম্বা, শুকনো হাড় বার করা এমন একরকম চেহারা। যা দেখে বয়স আন্দাজ করা একেবারে অসম্ভব। পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন যে কোন বয়সই তাঁর হতে পারে। তবে তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গরা তাঁর বয়স আন্দাজ করা ছেড়ে দিয়ে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে গত দু'শ বছর ধরে পৃথিবীর নানা স্থানে তিনি ভ্রাম্যমান এবং নানা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

তবে হ্যাঁ, যে কোন পরিবেশে ঘনাদা মুখ খোলেন না। তাঁর মুখের অমৃতবাণী শোনার জন্য প্রয়োজন বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেস এবং শিবু, শিশির, সুধীর, গোরের মত সাগরেদ; রামভুজ, বনোয়ারীর মত খাদ্য প্রস্তুতকারক বা বাহক এবং লছ্‌মনিয়ার মতো তৎপর কর্মী।

এই সবের সমাহার হলে ঘনাদা কখনো আমাদের নিয়ে যাবেন বিজ্ঞানের জগতে, কখনো বা ইতিহাসের অন্ধকারময় অধ্যায়ে আবার কখনো বা রোমাঞ্চকর অভিযাত্রায়।

মধ্যমণি ঘনাদার আড্ডাস্থল থেকে মশার প্রসঙ্গ উঠলে হয়তো মুহূর্তের মধ্যে পাঠক সাখালীন দ্বীপে হাজির হয়ে জাপানী কীটতত্ত্ববিদ্ নিশিমারার সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্য হবেন। মশার লালা পরিবর্তনের বিস্ময়কর কাহিনি শুনে উৎকণ্ঠায় থাকবেন আবার ঘনাদার প্রচন্ড চাপড়ে মশা আর নিশিমারার ভবলীলা সাঙ্গ হলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন।

আবার ইউরেনিয়াম রেডিয়াম প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু চোরদের জব্দ করার জন্য কীভাবে দূরবীনের খুলে পড়া কাঁচের সাহায্যে ঘনাদা ঘাসে আগুন ধরিয়ে কেল্লা ফতে করলেন তা শুনে পাঠক থ হতে বাধ্য। কিংবা এক ক্ষণজন্মা পিঁপড়ে কীভাবে গণেশঠাকুরের শুঁড়ে সুড়সুড়ি দিয়ে মহাভারতকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিল সে কাহিনি যেমন কৌতূহলকর তেমনি মজারও বটে।

আর একটি মাত্র পঙ্গপালকে ধরে তার উপর ওষুধ প্রয়োগ করে কী কৌশলে গোটা ইউরোপকে শস্যহীন, দুর্ভিক্ষপীড়িত হবার বিপদ থেকে মুক্ত করলেন তা জানলে ঘনাদা যে ভাল রকমের বিজ্ঞানী ছিলেন তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হই আমরা।

ঘনাদা আবার বিশ্ব পরিব্রাজক। ইংলন্ড, প্যারিস, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ভিয়েনা, খার্তুম, লিমা, সান্তিয়াগো, জর্জ টাউন, হংকং ইত্যাদি স্থানে ঘনাদার অনায়াস যাতায়াত।

পৃথিবী পরিক্রমায় তার জুড়ি নেই এটা বললে কম বলা হবে। অন্য গ্রহেও তাঁর কর্মকান্ড তারিফ করার মত। মঙ্গলগ্রহে গিয়ে কাঠ পোড়া ছাই দিয়ে সাথীদের বাঁচানো এবং উস্তাদ বৈজ্ঞানিক লুটাভিক্‌কে বেঁধে রেখে কীভাবে মঙ্গলগ্রহের আবিষ্কার পর্ব সেরে আবার শূন্যস্থানে চড়ে লুটাভিকের সাহায্যে পৃথিবীতে অক্ষত শরীরে ফিরে লুটাভিকের পরিকল্পনা ব্যর্থ করলো তা 'মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা' না পড়লে বিশ্বাস করা যায় না।

কত গুণের কথা আর বলি। বিশ্বের সেরা নেতৃবর্গের সঙ্গে ঘনাদার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট, জাপানের প্রধানমন্ত্রী, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, জার্মানীর চ্যান্সেলর, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সকলের সাথে তার অবাধ মেলামেশা। স্বভাব লাজুক বলেই ঘনাদা এসব কথা বেশি প্রকাশ করতেন না। আর বিশ্বের তাবড় নেতারা ঘনাদার কথাবর্তা আর দক্ষতায় মুগ্ধ হয়েই তাঁকে পাত্তা দিতেন বেশি। এমন মানুষ কটা পাওয়া যাবে যিনি ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, চীনা, রুশ, তিব্বতি, জাপানি, আরবি, পারসি থেকে সোহাহিলি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। এমন মানুষই বা কজন মেলে যিনি যুযুৎসু জানা সত্ত্বেও প্যাঁচে শত্রুদের কাবু করেন আর রিভলভার সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করার প্রয়োজনবোধ করেন না।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদাই একমাত্র বোঝাতে পারেন ই-হউ-ডব্লিউ-সি, হল এনার্জি আনলিমিটেড ওয়ার্লড কার্টেল অথবা এম-বি-ডি-ও, হল মিলিয়ন ব্যারেলস ডেইলি অব অয়েল ইকুইভ্যালেন্ট।

এমন ঘনাদাকে ভাল না বেসে পারা যায়। আর এর স্রষ্টাকে প্রণাম না করে থাকা যায়। লীলা মজুমদারের ভাষায় বলি, 'গল্পের রাজা বলতে প্রেমেন্দ্র মিত্র। নতুন ধরনের গল্পের পথিকৃৎও তিনি। দুঃসাহসের গল্প, রূপকথার গল্প, রোমন্সের গল্প, সুখ-দুঃখের গল্প, কল্প-বিজ্ঞানের গল্প, সব কিছুর সেরা এবং সোজা পথ। তিনি ছাড়া আর কে দেখিয়ে দেবেন। এমন মানুষ এ দেশে জন্মেছিলেন, সে আমাদের বহু সৌভাগ্য।'

সত্যি সৌভাগ্যবান বাঙালি পাঠক। কল্পকথার, রূপকথার প্রেমেন্দ্রর বিস্ময়কর সৃষ্টি ঘনশ্যাম দাস ওরফে ঘনাদা।

টেনিদা, ব্রজদা, ফেলুদা, ঋজুদা, ঘনাদা কে সবচেয়ে বড় এ বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা বলেছিলেন, ঘনাদার পায়ের ধুলোর কণা মাত্র পেলেই তিনি বর্তে যাবেন। এর থেকে তাঁর জনপ্রিয়তার একটা মাপকাঠি বোধহয় কল্পনা করা চলে।

বাংলা সাহিত্যের এই চালিয়াৎ চরিত্র তাঁর গল্পের গুল-বাগিচায় আমাদের এমন বিভোর করে রাখেন যে তাঁকে ভাল না বেসে পারা যায় না।

কে বলল তিনি শুধু কিশোর-কিশোরীদের? সাত থেকে সাতাশি সকল পাঠকের কাছে কোন্ ক্ষমতা বলে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর অমর সৃষ্টি ঘনাদাকে এত প্রিয় করে তুললেন ভেবে কুল কিনারা পাই না। কে বলল তিনি প্রেমেন্দ্রের? না, তিনি আমাদেরই ঘনাদা।

সমরেশ বসু স্মরণে

চলে গেলেন।

'দেখি নাই ফিরে'র লেখক তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় আমাদের জন্য রেখে নিরাসক্ত যোগীর মত চলে গেলেন। অসম্পূর্ণ থেকে গেল তাঁর ভাস্কর রামকিংকর বেইজকে নিয়ে লেখা স্থাপত্যধর্মী উপন্যাস যা তাঁর জীবনের বোধ করি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাংলা সাহিত্যভাণ্ডার এই অসমাপ্ত গ্রন্থটিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে ধরে রাখবে এ বিশ্বাস রাখা যায়।

মানুষের স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী। তাই আমরা অনেকেই ভুলে গেছি সমরেশ বসুর পিতৃদত্ত নাম সুরথনাথ বসু। বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে থাকবে বন্ধু দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া নাম সমরেশ বসু। মোহিনী মোহন বসু ও শৈবলিনী দেবীর চার ছেলেমেয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সমরেশ বসুর জন্ম ১৯২৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর। ঢাকার গ্রাজুয়েট স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশুনা। তার পর বুড়ি গঙ্গার ধার থেকে গঙ্গার ধারে আসা। নৈহাটির সুতাকলে চাকরি। শ্যামনগরে (আঁতপুর) বস্তির জীবন, অর্ধাহার, অনাহার, ডিম ও আনাজ ফেরি; ট্রেসার, ড্রাফটসম্যানের চাকরি, বিচিত্র শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে আসা এবং তাদের সঙ্গে জীবনে জীবন যোগ করা। আর কে না জানে জীবনে জীবন যোগ করতে না পারলে সত্যিকারের সাহিত্যিক হওয়া যায়না।

১৯৬৫তে লেখা 'বিবর' এবং ১৯৬৭তে লেখা 'প্রজাপতি' যা দীর্ঘ ১৮ বছর পর সুপ্রিম কোর্টের আদেশে মুক্তি পায়। এ দুটি বিতর্কিত উপন্যাস ছাড়া ও সমরেশবসু সারাজীবনে লিখেছেন অনেক। তার সমগ্র রচনার সঙ্গে পরিচিতির ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর কিছু উপন্যাস বা গল্প সম্পর্কে আমার ইচ্ছেমতো দু চারকথা বলছি এ কথা অবশ্য স্মরণ রেখে যে আমার মন্তব্যের সঙ্গে সকলে একমত নাও হতে পারেন।

জগদ্দলের সত্যভূষণ দাশগুপ্ত বা সত্যমাস্টারের অনুপ্রেরণায় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হিসেবে সমরেশ বসু আমাদের কি দিয়েছেন আর কি দিতে পারতেন সে আলোচনায় না গিয়ে আমরা কি পেয়েছি সেই আলোচনাই বরং ভালো, না হলে লক্ষ্মী কেন সরস্বতী হলেন না এই আপশোষেই যা পেয়েছি তাকেও হারাব।

সবরকমের 'বাদ'কে বাদ দিয়েও মানবতাবাদী সমরেশ বসুর আমরা দুই সত্তা পাই এক কালকূট সত্তা দুই সমরেশ বসু সত্তা। 'কোথায় পাবে তারে', 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'হারায়ে সেই মানুষে' এবং 'শাম্বর' পাশাপাশি 'গঙ্গা', 'টানাপোড়েন', 'বিটি রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে' বা 'উত্তরঙ্গ'র লেখক যে আলাদা মানসিকতার অধিকারী তা খুব সহজেই বোঝা যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন ''কালকূট যেন সংসারে এক সন্ন্যাসী। যখন তখন ভ্রাম্যমান। সমরেশ বসু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক এবং রসিক উদাসীন।''

নৈহাটির গঙ্গার ধারে জেলেদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার ফসল তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস 'গঙ্গা'। এই উপন্যাসে জেলেদের জীবনযাত্রা, তাদের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, নৌকা চালানো-সংক্রান্ত নানা পরিভাষা, নানারকমের ঢেউ-এর স্বরূপ ও সংজ্ঞা যার উল্লেখ ভদ্র সাহিত্যে পাওয়া যায়না তা তিনি অবলীলাক্রমে এবং যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহার করেছেন। 'উত্তরবঙ্গ'-এর কহিনীর নায়ক সিপাহী বিপ্লবের রণক্ষেত্র থেকে পলাতক এক হিন্দুস্থানী সিপাহী। 'বিটি রোডের ধারে' এবং 'শ্রীমতী কাফে'তে তিনি সেই সব মানুষকে এনেছেন যারা মানুষ হয়েও মানুষের মতো জীবন যাপন করেন না। যে যাই বলুন আমার তো মনে হয় 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'-তে কুম্ভমেলার প্রতিবেদক সমরেশ বসু শুধু প্রতিবেদন পাঠিয়ে আর ছবি তুলেই সাংবাদিকের কর্তব্য শেষ করেননি, অন্বেষণ করেছেন গোটা ভারতবর্ষের হৃৎস্পন্দনকে।

ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর পাশাপাশি গল্পকার সমরেশ বসুও বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন এবং এই প্রসঙ্গে অন্ততঃ আদাব, উরাতিয়া (মৃনাল সেনের 'জেনেসিস' ছবিতে যে গল্পের সাহায্য নেওয়া হয়েছে) ইঁদুর' এবং 'সুচাঁদের বারমাস্যা', 'পাড়ি', 'পেলে লেগে যা' 'কিমলিসের' নাম না করে পারছি না। জীবনশিল্পী সমরেশ বসু 'ইঁদুর', 'পাড়ি', 'পেলে লেগে যা' ইত্যাদি গল্পে শোষণ, বঞ্চনা, উৎপীড়ন এবং লাঞ্ছনা কী চূড়ান্ত রূপ নিতে পারে তা তাঁর জীবন্ত লেখনীতে তুলে ধরেছেন। যে 'আদাব' গল্প দিয়ে সমরেশ বসুর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত সেখানে দাঙ্গার অমানবিক অস্তিত্ব-স্বরূপের পাশাপাশি সর্বহারা শ্রমিকদের কথা সূতা-মজুর ও নৌকার মাঝির কথা ভেবেছেন। 'আদাব' গল্পের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি স্মরণ করি 'নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব। 'আদাব'। আমিও ভুলুম না ভাই-আদাব।'' মাঝি পাটিপে টিপে চলে গেলেও বুক ভরা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করছিল সুতা-মজুর। তারপর গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। এবং গল্পের শেষাংশ 'মাঝি বলছে পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।' কী বলিষ্ঠ বক্তব্যের মাধ্যমে দুশমনদের চিনে অন্যকে চেনাতে সাহায্য করছেন লেখক ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

আবার মন্বন্তর ও যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা 'সুচাঁদের বারমাস্যায়' কুচকুচে কালো সুচাঁদ, খাঁটি নমঃশূদ্রের গঠন যার শরীরে, পায়ের ঘাগুলো যার আগুনে পুড়ছিল সেই সঙ্গীছাড়া সুচাঁদ ভেলার ওপর এক লোভী শেয়ালকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে কত কথা বলতে বলতে চলছিল। সেই শেয়ালটাও সুচাঁদের চোখের সামনে পাঁকে ডুবে গেল। 'হালার সঙ, মর তর লেইগ্যা কেউ কান্দব না, কেউনা।'

পনেরই আগস্ট ভারতের নয়া প্রধানমন্ত্রী যখন দিল্লীর ঐতিহাসিক লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা ওড়াচ্ছেন সেই পটভূমিকায় 'মরেছে প্যালগা ফরসা' গল্পের শুরু। মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা, দে হরিবোল। প্যালগা নাম। দেখতে ফরসা বলে প্যাল্‌গা ফরসা। আট দশ থেকে চৌদ্দ পনেরো বছরের ন্যাংটার দলে থাকে। এই প্যালগা, চটা, বগ্‌গি এবং কোড়ের দল। এরা চোর পকেটমার বা মাস্তান নয়। এরা এক শ্রেণীর ভিখিরি। প্যালগাকে মেরেছে মুড়িওয়ালা ভুঁড়িওয়ালা বদমাস। কিন্তু থানার বড়বাবু থেকে সেপাই পর্যন্ত সব তার হাতে। ফলে প্যালগার মৃত্যুর কোন খোঁজখবর নেবার কেউ নেই। মড়া পোড়ানোর খরচ দেবে বলেছে তাতেই

ভিখিরিরা আহ্লাদে আটখানা। শহরের বাবুদের চোখে এদের মিছিল সঙের মিছিল। সিনেমা হলের সামনে এদের 'দে হরিবোল' চিৎকারও ভাল লাগে না পুলিশ ভ্যানের কর্মকর্তাদের।

উপসংহারে বলা হচ্ছে সিনেমা হলের মাথায় লাল কাপড়ের ওপর সোনালি অক্ষরের লেখাগুলো ছিল :

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ ১৯৭৯!

'শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ'

'সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠুক ওদের জীবন।'

প্যাল্‌গা ফরসার শবযাত্রীরা সিনেমা হলটা পেরিয়ে আবার হাঁক দিল— 'মরেছে প্যালগা ফরসা'। কেবল কোড়েটাই কাঁদছে আর দুধের দাঁতগুলো চিবিয়ে বলছে, 'কদমসার ভুঁড়ির মাংস একদিন কামড়ে ছিঁড়ে খাব।'

ভাষা— কি উপন্যাসে কি ছোট গল্পে সমরেশ বসুর এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর যে কোন গল্প বা উপন্যাস একটু খুঁটিয়ে পড়লেই সেটা বোঝা যায়। কি বঙ্গালী উপভাষা ব্যবহারে, কি অন্য আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে, কি হিন্দি ভাষা ব্যবহারে, অতি সচেতন মন তার সব সময় কাজ করেছে। 'কিমলিস' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বেচন, বাবা বানোয়ারী, মা রামদেই বা স্ত্রী ঝুনিয়া প্রত্যেকের মুখেই মনস্তত্ত্বসম্মত উপযোগী ভাষা গল্পের আলাদা মর্যাদা এনে দেয়। 'কিমলিস' গল্পে সমরেশ বসু কেবল চরিত্রকে কেন্দ্র করে গোটা একটা পরিবার কীভাবে কিমলিস হতে চলেছে তার সুন্দর বর্ণনা করেছেন। পরিস্থিতি কীভাবে মানুষকে একটা জীবন দর্শনের দিকে ঠেলে দেয় তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ কিমলিস গল্পটি। তাই স্বার্থপর কালিকা প্রসাদের হুমকিকেও আর পাত্তা দেয় না বনোয়ারী। সে তখন বলে 'বাবু সাহেব হাজার হো হম তো এক কিমলিসকো বাপ হ্যায়।' রাম দেই-এর চোখ জলে ভিজে ওঠে— 'তু কেতনা বড়া কিমলিস বন্ গয়া। তু চলা যানেসে, কিস্‌কো যায়ে না। এ রামদেই কা কি নাহি!' আর গল্পের শেষে সব সন্দেহ ঘুচে গেছে, ঝুনিয়া স্বামীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছে।

এই সব নামকরা গল্পের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত আমার প্রিয় একটা গল্প দিয়ে উপসংহার টানি। রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে প্রকাশিত গল্পটির নাম 'বিহিত'। শহর জীবনের পরিবেশে কখনও কখনও ছড়িয়ে পড়ে বীভৎস একটা আতঙ্ক, তখন শান্তি প্রিয় একজন মানুষও কীভাবে অসাধারণ ভূমিকা নিতে পারে তার একটা কাল্পনিক গল্প ফেঁদেছেন লেখক। পাড়ার এক মস্তানকে ভয়ে কীভাবে সমীহ করে রাস্তার কুকুর থেকে সাধারণ মানুষেরাও, তার গল্প বলেছেন লেখক। উত্তম পুরুষে লেখা গল্পটিতে লেখক নিজেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে প্রতিবেশীদের মনে কীভাবে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন তার কাহিনী আছে এখানে। নিজের লেখা গল্পটির উপসংহার হলো নিম্নরূপ :

লেখক মহাশয়,

আপনার 'বিহিত' নামে কাল্পনিক গল্পটি পড়লুম। পড়ে ভাবলুম বাস্তবে যদি আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে ঐ রকম ঐক্যবোধ থাকতো, যদি তাঁরা ঐরকম সাহসী হতেন, তা হলে অনেক অন্যায় ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি হওয়া যেতো।

ইতি— সমরেশ বসু

বিবেকানন্দ-চিন্তায় মনুষ্যত্ববোধ

আমরা প্রায় বলি লোকটা মানুষ হলে কী হবে, ওর মনুষ্যত্ববোধ নেই।

মনুষ্যত্ব কাকে বলে? সহজ কথায় কীভাবে ব্যাখ্যা করি। বিমূর্ত জিনিসের ব্যাখ্যা সুসাধ্য নয়।

মনুষ্যের ভাব মনুষ্যত্ব। কিন্তু ব্যাকরণগত এই ব্যাখ্যায় কি মনুষ্যত্ববোধ ধরা পড়ে? পড়ে না। মনুষ্যের কোন্ কোন্ বিশেষ ভাব মনুষ্যত্ব বলে চিহ্নিত হবে? দয়া, মায়া, ভালোবাসা, দান, দাক্ষিণ্য, সরলতা, নির্লোভতা, উদারতা, অকৃপণতা ইত্যাদির কোন্গুলি ঠিক মনুষত্বের সংজ্ঞাকে বিশেষিত করবে? না এর সবগুলো? বড় জটিল প্রশ্ন। ততোধিক জটিল অল্প কথায় এর উত্তর দান।

তবু বলি শুধু ধন-মান বা উচ্চশিক্ষা বা বিদেশি ডিগ্রিই মনুষ্যত্বের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়। এগুলি থাকা সত্ত্বেও একজন অমানুষ হতে পারেন আবার এগুলো না থেকেও একজন মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারেন। কিছু বিক্ষিপ্ত উদাহরণ এর সহায়ক হয় কিনা বিচার করা যাক।

জনৈক উচ্চশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ তার বিলাসবহুল বাসভবনে মশারির অভাব দেখিয়ে তার শিক্ষিত পিতৃদেবের আগমন নিরস্ত করছেন।

কোন বঙ্গবধূ তার শ্বশ্রূমাতাকে তার উপস্থিতিই সংসারে অশান্তির কারণ নির্ধারণ করছেন।

কোন বধূমাতা তাঁর স্বামী দেবতাকে দিবারাত পরামর্শ দিচ্ছে— যে সাতপাকে বেঁধে সে তার স্বামীর বধূ হয়েছে সত্য, কিন্তু স্বামীর পিতা বা মাতার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

কোন খুল্লতাত বোঝাচ্ছেন তাদের ঘরের যে মেয়েকে জামাতা বাবাজীবন বিবাহ করেছেন তার সঙ্গে কন্যার সম্পর্ক তো ফিফটি-ফিফটি। গিভ এন্ড টেক তো ম্যারেজের মর্মকথা।

কোন শাশুড়ি তার একমাত্র জামাতাকে অহরহ জানিয়ে চলেছেন যে তার পিতৃকুলের নির্ধনতা দেখেই তার সামাজিক অবস্থান বোঝা যায়। উচ্চশিক্ষিতা কন্যার মস্তক যেন জামাতার আত্মীয় সংসর্গ কোনভাবে অবনত না করে।

কোন পিসিমা তাঁর আদরের বিবাহিতা ভাইঝিকে বোঝাচ্ছেন যে বিবাহের পূর্বে কোপ্তা কাবাবে অভ্যস্ত তাঁর ভাইঝি যেন শ্বশুর কুলের আলুসেদ্ধ ভাত খেয়ে আজন্মলালিত মূল্যবোধ খাটো না করে।

জনৈক শিক্ষক ক্লাশরুমে পড়ানোর সময় নানাধরনের শারীরিক সমস্যায় ভোগেন কিন্তু লক্ষ্মী পুজোয় (!) তাঁর ক্লান্তির চিহ্নমাত্র থাকে না।

অভিন্ন হৃদয় আইনজ্ঞ প্রতিবেশী বন্ধুকে এক ইঞ্চি ড্রেনের জন্য মামলা রুজু করার পরামর্শ দেন।

বৈষ্ণব দোকানী আগমার্কা মশলার গলদ দেখিয়ে বেশি লাভের আশায় খরিদ্দারকে সুরকি মাখানো হলুদগুঁড়োর কাটতি করেন।

কোন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট পাড়ার ক্লাবকে হস্তগত করে সেচবিভাগের জায়গা বেমালুম হস্তগত করেন।

কোন কমিশনার এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নকে কাঁচকলা দেখিয়ে একই কলের মুখকে চতুর্মুখ ব্রহ্মা বানিয়ে দেন এবং প্রয়োজনে একচক্ষু হরিণের গল্পটি মনে করিয়ে দেন।

কোন মন্ত্রী এরোপ্লেনে একমাত্র কন্যার বিয়ে দিয়ে দেশ সেবার পরাকাষ্ঠা দেখান।

এরকম অজস্র উদাহরণ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে বিত্ত, শিক্ষা, খ্যাতি, মনুষ্যত্ব বোধের মানদন্ড হতে পারেনা। এগুলির সমবায়ে যেমন অভাবেও তেমনি সমাজে যথার্থ মানুষ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

শিক্ষার চেয়ে দীক্ষাই এক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের মাপকাঠি। এই দীক্ষার জন্য গুরু ধরার প্রয়োজন নেই, আবার গুরু ছাড়ারও প্রয়োজন নেই। সমাজের পাঠশালায় চোখ কান খোলা রেখে উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে একজন অশিক্ষিত ব্যক্তিও মনুষ্যত্বের দীক্ষায় দীক্ষিত হতে পারেন।

পিতা, মাতা, গুরু, বন্ধু, শিক্ষক এক্ষেত্রে সহায়কও হতে পারেন, প্রতিবন্ধকও হতে পারেন।

স্বশিক্ষায় হোক আর আহৃত শিক্ষায় হোক এই প্রতিবন্ধকতা দূর করেই একমাত্র প্রকৃত মনুষ্যত্বের উত্তরাধিকারী হওয়া চলে। এ সাধনা মানুষের সমগ্র জীবনের সাধনা। 'Be man and make man' বলা সহজ কিন্তু আচারে আচরণে এই man -যিনি নিছক হোমো স্যাপিয়েন্স নন, শুধু আহার বিহার ও বংশরক্ষাকে যিনি জীবনের সার বলে মনে করেন না, 'আপনি আর কপনি' কে যিনি জীবনের ব্রত মনে করেন না, তিনিই সত্যিকারের মানুষ।

আমার ধারণায় স্বামী বিবেকানন্দ এই ধরণের মানুষ গঠনের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন।

আমার পথ, আমার ঘাট

আমার পথ হরির বটতলা। আমার ঘাট ইটখোলার ঘাট। গ্রাম উত্তর শুকদেবপুর। পোস্ট অফিস গুমুকবেড়িয়া, থানা কুলপি, জেলা চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ।

জীবনে দেশ-বিদেশের অনেক পথে চলেছি, জীবনে অনেক ঘাট দেখেছি কিন্তু ছোটবেলার সেই হরির বটতলার পথ ও ইটখোলার ঘাট আমার স্মৃতিতে বেশি জাগরূক।

হরিরবটতলা

কে এই হরি? হরি আসলে হরিঠাকুর। না, রান্নার ঠাকুর নয়, বামুন ঠাকুর। আসল নাম সম্ভবত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়— লোক মুখে হরিঠাকুর। বাসস্থান উত্তর শুকদেবপুর হলেও তাঁকেও ছোটবেলায় আমরা খুবই কম দেখেছি। বড়দের মুখে শোনা মগরাহাটে নাকি তাঁর হোমিওপ্যথিক ডাক্তারখানা ছিল। চিকিৎসায় সুখ্যাতি ছিল তাঁর। পরবর্তীকালে তাঁরই পুত্র নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ডায়মন্ডহারবারের দীর্ঘকালের স্বনামধন্য হোমিও-চিকিৎসক। মগরাহাটে থাকাকালীন বাসের ধাক্কায় তাঁর জীবনান্ত হয়— এও শোনা কথা।

কিন্তু হরির বটতলা (স্থানীয় উচ্চারণে বড়তলা) আমার বাল্যজীবনের পরতে পরতে বাঁধা। এ পাড়া থেকে ওপাড়া যাবার মাঝে পড়ে এই বটতলা। আরো স্পষ্ট করে বললে উত্তরের পাড়া থেকে দক্ষিণের পাড়ার সেতুবন্ধ এই হরির বটতলার পথ। বটতলার তোরণ-পথ। এই তোরণ তৈরি হয়েছে পূর্ব পশ্চিমের দুই বটবৃক্ষের হাত ধরাধরি করা শাখার সমন্বয়ে। তোরণের উচ্চতা আনুমানিক দু মানুষ উঁচু। একদিকের বটবৃক্ষের সঙ্গে অপর অশ্বত্থের যুগল মিলন। ওপর থেকে দীর্ঘ ঝুরি নেমে নেমে নকল ক্ষুদ্রাকার বটবৃক্ষের আকৃতি। ঝুরির সঙ্গে গুল্মলতার গলাগলি, দুপাশে ঘন জঙ্গল। জানা ও নাম-না-জানা নানা গাছের সমাহারে দুই পাশ দুর্গম। কিন্তু মাঝের এই পথ পরিষ্কার। অনায়াসেই কয়েকজন মানুয পাশাপাশি যেতে পারে। শুধু বটতলার পথ অতিক্রম করতে কুড়ি-পঁচিশ সেকেন্ড লাগার কথা। কিন্তু এই পথ ছিল আমার কাছে অফুরন্ত। বিশেষ করে সন্ধ্যার আঁধারে— তাও যদি আবার কৃষ্ণপক্ষ হয়। মনে হত সারাদেশের ভূতগুলো সব একত্র হয়ে সব ওই বটতলা সংলগ্ন অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। ওপরের দিকে তাকালে হয়তো নানা ধরণের ভূত-পেত্নী-শাঁকচুন্নির চোখগুলো দেখা যাবে। কতজনে কত লম্বা ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে আছে কেই বা জানে। অতএব এই টুকু পার হতে গেলেই একমাত্র রামনাম সম্বল। রাম-রাম-রাম-রাম। এর সঙ্গে যোগ হতো ঠেঙাড়েরা বসে আছে কোনো লম্বা ডালে হাতে দড়ির ফাঁস নিয়ে। আর দুনিয়ার সমস্ত বিষধর সাপগুলো যেন ওই পথ ছাড়া যাবার জায়গা পেত না। ওই টুকু পেরোলেই, বুকের দুম দাম ধড়াস ধড়াস শব্দের ইতি। তখন সোজা রাস্তার দু পাশে কখনো ভরা কখনো ন্যাড়া মাঠ। তাই আমার স্মরণীয় পথ নিঃসন্দেহে হরির বটতলার পথ।

ইটখোলার ঘাট

আমাদের জন্মের কয় পুরুষ আগে ওই ঘাট সংলগ্ন পুকুর কাটা হয়েছিল জানিনা। সম্ভবত ইটের পাঁজা দেবার উপলক্ষ্যে পুকুর কাটা হয়েছিল এবং খোলা (টালি) তৈরির কারখানা ছিল কিনা তাও কেউ বলতে পারত না। তবুও নাম ছিল ইটখোলার ঘাট। উত্তরে আমাদের বাড়ি দক্ষিণে বিস্তীর্ণ মাঠ, পূর্বে ও পশ্চিমে পাড়, পূর্বের পাড় সংলগ্ন বিশাল ঘন বাঁশবাগান। রাতের সমস্ত অন্ধকার জমা হত ওই বাঁশবাগানে। যেখান থেকে প্রহরে প্রহরে থেকে থেকে শিয়ালের হাঁক শোনা যেতো। কোনো বাঁধানো স্নানের ঘাট নয়। কখনো ডাকরমচার খন্ড খন্ড গুঁড়ি, কখনো বাবলা বা কেলকদম, কখনো বা তাল খেজুরের টুকরো টুকরো খন্ড দিয়ে তৈরি সে ঘাট। স্নানের ঘাট, বাসনমাজার ঘাট, মুখ ধোয়ার ঘাট, জলশৌচ করার ঘাট, বঁড়শিতে মাছ গেঁথে বড় বড় শোল মাছ ধরার ঘাট। এই ঘাট দিয়েই দল বেঁধে হাঁসেরা নামত প্যাঁক প্যাঁক শব্দ সহকারে। এই ঘাট থেকেই হাঁসেরা ফিরত সন্ধেবেলায় দলবেঁধে। আসন্ন আঁধারের মধ্যে এই ঘাট থেকেই আসতে আসতে কত হাঁস চলে যেত খটাশের মুখে। কোথায় গেল, কোথায় গেল করতে করতে হয়তো কোনো চন্ডীমন্ডপের আড়কাঠে বা গোয়ালঘরের ঘুঁটে মাচায় পাওয়া যেত চেনা হাঁসের শেষ কিছু চিহ্ন। এই ঘাট থেকেই গন্ডি কেটে উত্তরের পঞ্চানন্দ থান পর্যন্ত যেত কত স্ত্রী পুরুষ তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্যে। ভুলি কেমনে? এত স্মৃতি বিজড়িত আমার ইটখোলার ঘাট।

স্মৃতি পথ বাহি

চিত্র ১

Swallow, Swallow, little Swallow, will you not stay with me one night longer? পড়ানো হচ্ছে Oscar Wilde এর 'The Happy Prince' এর নির্ধারিত অংশ। পড়াচ্ছেন আমাদের প্রধান শিক্ষক শ্রী বৃন্দাবন মন্ডল। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রধান শিক্ষকের কনিষ্ঠ পুত্র অমল।

মন চলে গেছে কোন সুদূরে— কোন এক সুরম্য অট্টালিকার ওপরে— যেখান থেকে জগতের সব কিছু দেখা যায়— দেখছেন সুখী রাজপুত্র। বেঁচে থাকার সময় সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদের মধ্যে থেকে যা কোনদিন তার চোখে পড়েনি। এমন সব করুণ দৃশ্য— বাস্তব জগতের জীবন্ত দৃশ্যের টুকরো টুকরো ছবি। মনের মধ্যে গুন্‌গুন্ করছে রাজপুত্রের কাতরোক্তি— হে আমার প্রিয় সোয়ালো পাখি, আর একটা রাত্রির আমার সঙ্গে থাকবে না? রাজপুত্রের চোখে জল টলমল। হঠাৎ প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের চোখ জানলা দিয়ে গেছে খেলার মাঠে। — কলা ব্যপারী, ও কলা ব্যপারী, এদিকে এসো, এদিকে। ক্লাসের মধ্যেই গোটা কলার কাঁদি নিয়ে কলা ব্যাপারী দামদস্তুর করে নির্দেশ মতো তাঁর বাড়িতে কলার কাঁদি নিয়ে গেল।

এই আমাদের সেকালের প্রধান শিক্ষক শ্রী বৃন্দাবন মন্ডল। শুনেছি সেকালের ম্যাট্রিকুলেশানের স্কলার। শোনা কথা, মশারি ছেঁড়া পরে নাকি এক সময় স্কুলে গেছেন। আমাদের সামনে সবসময় সাদাসিধে পোযাকেই থাকতেন। মুখে ছিল বাংলার বাঘ আশুতোষের গোঁফের আদলে এক জোড়া গোঁফ।

চিত্র ২

How fair is the rose!

ডান হাতে সুদর্শন দাড়িটাকে নাক বরাবর তুলে ধরলেন।

What a beautiful flower!

সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দাড়িটাকে স্বস্থানে রাখলেন।

ইংরেজি কবিতা পড়াচ্ছেন নলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রেণী সপ্তম।

গোটা দুই stanza পড়ানোর পরে এবার আমাদের reading পড়ে শোনানোর নির্দেশ। কয়েকজনের পরে আমার পালা এল। পড়ার পরে প্রশ্ন— তোর নাম কিরে?

বললাম।

কোথায় থাকিস?

অবিনাশ কয়ালের বাড়ি।

তখন গোবিন্দপুরের কয়ালদের বাড়িতে থেকে অনেক গরীব ছাত্র লেখাপড়া করত। বুঝে নিলেন আমি তাদেরই একজন।

চিত্র ৩

গায়ে হাফশার্ট, পরনে ধুতি, মুখে সিগারেট আর মাঝে মাঝে খুক খুক কাশি। আমাদের অন্যতম প্রিয় শিক্ষক অমৃতলাল সরদার। ক্লাসে বসে খাতা দেখছেন। হঠাৎ হেসে উঠে আমাদের ডাক দিলেন— দেখে যা তোরা। আমরা এক ঝাঁক উঠে ওঁকে ঘিরে দাঁড়ালাম।

প্রশ্ন ছিল অনেকটা এইরকম— শরৎচন্দ্রের সাইক্লোন অবলম্বনে ঝড়ের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র অঙ্কন কর। যতদূর মনে পড়ে পাঠ্যপুস্তকে ঝড়ের একটা ছবি থাকলেও থাকতে পারে। অমৃত বাবুর দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল— আমাদের কোন সহপাঠী ঝড়ের কোনো বর্ণনা না দিয়ে শুধু খাতার মধ্যে ছবি এঁকেই উত্তর সেরেছেন।

চিত্র ৪

আমার মতো অনেকেই যমের মতো ভয় পেতেন বিজয়বাবুকে। বিজয় কৃষ্ণ দাস। সহকারী প্রধান শিক্ষক। আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় নবম শ্রেণীতে।

প্রশ্ন— ভালো করে চুল আঁচড়াস্‌নি কেন?

উত্তর— চিরুনি নেই।

সক্রোধে পকেট থেকে তিনআনা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে আদেশ— কাল থেকে ঠিকমত চুল আঁচড়ে তবে ক্লাসে ঢুকবি।

ইংরেজির খাতা দেখছেন বিজয় বাবু ক্লাসে বসে। পেছনে দাঁড়িয়ে হাত পাখা নিয়ে বাতাস করছি। মরুভূমিতে মরূদ্যানের মত মাথার মাঝখানের কয়েকটা চুলে বাতাস দিচ্ছি। দুরু দুরু বক্ষে সকলেই দেখছে কার নম্বর তিনের কোঠায় উঠল। কারণ বিজয়বাবুর হাতে চল্লিশের ওপরে নম্বর মানে একটা বলার মত খবর। আমার নজর কিন্তু বিজয়বাবুর মাথাটাকে ভালো করে দেখা। হয়তো যে মানুষকে সামনে থেকে তাকাতে ভয় করে পেছন থেকে ভালো করে যতটুকু দেখা যায় এই ধরনের কোনো কৌতূহল কাজ করে থাকবে।

চিত্র ৫

পঁচিশে বৈশাখ মানে পরেশবাবুর স্মৃতি। পরেশবাবু— পরেশ লাল সরদার। আমাদের বাংলার মাস্টার মশাই। যারা যারা আবৃত্তি বা নাটকে অংশ নেবে তাদের ডাক পড়ে। আবৃত্তি ও নাটকে নির্বাচিত হলাম। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'সমালোচক' কবিতাটি সেকালের দর্শকদের অনুরোধে আমাকে দুবার আবৃত্তি করতে হয়েছিল। একালের প্রদীপ ঘোষ-ব্রততীরা শুনলে হেসে মরে যাবেন। আমাদের সময় পরেশবাবু 'মুকুট' ও 'ডাকঘর' দুটো নাটক করিয়েছিলেন বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই। তবে আমার মনে পড়ে ডাকঘর নাটকের শেষ দৃশ্যে রাজকবিরাজ ইত্যাদির সামনে প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। সুধার পাঠ করেছিল আশিস বলে একটি ফুটফুটে ছেলে। পদবিটা ভুলে গেছি। সুধা বলেছিল— অমলকে বোলো সুধা তাকে ভোলেনি। সেদিনের অমল— আজকের আমি তাকে ভুলিনি, কিন্তু পরবর্তীকালে কোনদিন আর সুধার দর্শন মেলেনি।

চিত্র ৬

স্কুলে একজন নতুন মাস্টার মশাই এসেছেন। লালমোহন পাল। হাসি হাসি মুখ। কমলেশ-বাবু বা বিজয়বাবুর মতো দেখলেই ভয় করেনা। ক্লাসে পঠিতব্য বিষয়ের বাইরেও নিয়ে যান। বেশ একটা নতুন আমেজ, নতুন দিক। আমার আবার বাড়তি পাওনা স্কুল বিল্ডিংয়ের যে ঘরে থাকতাম সেই ঘরে তিনিও ছিলেন কিছুদিন। ফলে খোলামেলা গল্পের সূত্রে ব্যক্তি মানুষটি আমাদের মত ছোট ছোট শ্রোতার কাছে একদিন কেঁদেই ফেলেছিলেন। সেই প্রথম জানলাম যে মাস্টার মশাইরাও কাঁদে। তার পরে অনেক জনপ্রিয় অনেক পুরানো হয়েছেন তিনি। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি চিরকালের 'নতুন মাস্টার' থেকে গেছেন।

চিত্র ৭

স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় সংস্কৃত ৯০ এর ওপরে নম্বর পেয়েছি। খাতা নিয়ে ক্লাসে ঢুকে সেই দীর্ঘ দেহী সুদর্শন পন্ডিত মশাই নাম ধরে ডাকতে কাছে গেলাম। অত্যন্ত স্নেহে গায়ে হাত বুলিয়ে বংশ পরিচয় থেকে আহার-বাসস্থানের খুঁটিনাটি খবর নিয়ে বেঞ্চে পাঠালেন। সেদিন থেকে শুরু করে আমার জীবনের দীর্ঘ যাত্রাপথে তিনি কতভাবে কতরূপে আমাকে আজকের আমিতে ঠেলেছেন তা আলাদা প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে। দীর্ঘ বর্ণনায় যাব না, শুধু দুটো একটা উদাহরণ দিই। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় আমার অতিরিক্ত কোনো বিষয় না থাকাতে শিক্ষক মহাশয়রা সন্দিহান ছিলেন যদি প্রথম বিভাগ না হয়। আমিও নিঃসম্বল। তাই স্কুল নাকি কোনো শিক্ষককে তিনমাসের জন্য কিছু পারিশ্রমিক দিতে রাজি ছিল। কিন্তু স্কুলের দেওয়া পারিশ্রমিক মনঃপূত না হওয়ায় তিনি রাজি হননি। শুনেছি পন্ডিতমশাই রেগে বলেছিলেন— যদি কারও ক্ষমতা থাকে তো অ্যাডিশনাল ছাড়াই হবে। সুখের কথা আমি তার মুখ রাখতে পেরেছিলাম। আর তাঁর জন্যই আমি পরবর্তীকালে বেলঘরিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থি আশ্রমে বিনা খরচে থাকা খাওয়া ও পড়ার সুযোগ পাই।

অধ্যাপনা জীবনে যখন সংস্কৃত সাহিত্য পড়াতে গিয়ে মাঘের 'শিশুপালবধ' বা ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়'-এর কোনো কোনো শ্লোকে দাঁত ফোটাতে গিয়ে তাবড় তাবড় বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছ থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়েছি, সে সময়ে একদিন তিনি সহজেই আমার মুশকিল আসানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। হে আমার মুশকিল আসান— আজ তোমাকে জানাই অজস্র প্রণাম। আমাদের সেই প্রণম্য হেডপন্ডিত মশাই— শ্রী অমূল্য রতন ভট্টাচার্য। আমার জীবনে তিনি অমূল্য রতন।



জন্ম ১লা জানুয়ারি, ১৯৪৩। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার এম. এ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডায়মন্ডহারবার অঞ্চলের উপভাষা বিষয়ে গবেষণা করে পি.এইচ-ডি ডিগ্রি। নেতাজীনগর ডে কলেজের এই প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ও রিডার বলাইচাঁদ হালদার ও বলাই হালদার দুনামেই লিখে থাকেন। বর্তমানে নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বড়োদের জন্য গল্প, প্রবন্ধের পাশাপাশি ছোটদের জন্যও লেখেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়।

প্রকাশিত গ্রন্থ - ডায়মন্ডহারবার অঞ্চলের বাংলা উপভাষা, ছোটোর ছড়া বড়োর ছড়ি, ছড়ায় ভরা বসুন্ধরা, ছুটছে ছড়ার ফোয়ারা, এক আঁজলা লিমেরিক, অন্য ছড়া, রকমারি ছড়া, বীণাপাণির বর (গল্পসমগ্র)।

শখ- বই পড়া ও বেড়ানো। সমাজ জীবনে প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার শরিক।

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ